সেই চিরকাল

দেবেশ দাশ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সেই চিরকাল

উৎসর্গ

সেই চিরকালের মনের সন্ধানী

সুমথনাথ ঘোষ

সুহৃদবরেষু

সূচী

সেই চিরকাল

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা-মণিপুর সীমান্তে যুদ্ধে হেরে ক্রমে ক্রমে পিছু হটে আসতে বাধ্য হল।

এমন সময় মার্কিন বিমান বহর সুযোগ বুঝে আমাদের পিছনে পিছনে হঠাৎ হানা দিতে লাগল। সম্মুখ-সমরের সময় তারা কোথাও ছিল না, কিন্তু পিছনে হানার সময় তাদের বিক্রম দেখে কে? হালের লড়াইয়ের কৌশলই এই। তুমি কেন মিছেমিছি যাবে প্রাণে মরতে? যন্ত্রকে দাও তোমার হয়ে বদলী লড়তে।

মনে আছে ছেলেবেলায় এ নিয়ে দুর্বল বন্ধুদের লজ্জা দিতে ছাড়তাম না। লাট্টু খেলার সময় ঝগড়া আরম্ভ হলেই চেঁচিয়ে সবাইকে লড়ে যাবার জন্য হাঁক দিতাম। বলতাম, বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী, হাত থাকতে মুখে কেন?

এখন দেখছি বাঙ্গালীর মত বুদ্ধিমান অন্য লোকও আছে। এরা তাই আকাশ থেকে ফাইটার প্লেনের মেশিনগানের লাট্টু চটাপট ঘোরাতে থাকে। যেন বলে যায়,—কল থাকতে হাতে কেন?

আর সারা পৃথিবীটাই তো কল হয়ে গেল। কলের মতই চলেছি রোজ জঙ্গলে লুকিয়ে যুদ্ধ করতে করতে। গেরিলাযুদ্ধ করে আগাগোড়া ইংরেজ দলদের হটিয়ে এসেছি কলের মত। কলের মতই রোজ রাত্রিতে কোন-না-কোন মণিপুরী বা নাগা বা কেরেন গ্রামের মধ্যে হাজির হয়ে তাদের সব রান্না-করা ভাত-তরকারিতে ভাগ বসাতাম। ভাগ বসানো কথাটা অবশ্য একটু মোলায়েম করেই বলা হল। খেয়ে নিতাম যতটা দরকার, আর বাকিটা সম্ভব হলে বেঁধে নিতাম। আমাদের পিছনে তো ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যের মত লম্বা সরবরাহকারীর দল নেই যে, একটানা খাবারের যোগান দিয়ে চলবে। যতটা সম্ভব, ওদেরই সরবরাহ লাইনে হঠাৎ হামলা দিয়ে নিজেদের সংস্থান করে নিই। তাতে যখন কুলোয় না বা ওদের রসদ যখন আসা স্থগিত থাকে, তখনই শুধু আমরা গ্রাম চড়াও হয়ে পেট-পূজো করে নিই। সঙ্গে হয়তো নিয়ে গেলাম গোটা দুই কুমড়ো বা হাঁস-মুরগী, আর বলে গেলাম—খবরদার, দেশের দুষমনকে জানিও না যে, আমরা এসেছিলাম।

আমি তো একদিন আমার প্ল্যাটুনের সবাইকে শুনিয়েই দিলাম—তোমরা হচ্ছ বাঙ্গালী মেয়ে।

শুনে সবাই খুব তাজ্জব বনে গেল! কেন? কেন? আমরা কি বন্দুকের ঘোড়া টিপি হারমোনিয়ামের চাবির মত? না 'কদম কদম বঢ়ায়ে জা'—গানটি তোমাদের মেয়েদের মত মিঠে গলায় গাই?

হেসে শুধু জবাব দিয়েছিলাম—

"খেয়ে যায়, নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে
হায়, হায়, ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

বলা বাহুল্য, টমির দল বা "জি আই রা" "ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে" বলে রসিকতা করবার জন্য প্রাণ ধরে অপেক্ষা করতে পারত না। পালিয়ে যেত ধেয়ে। আমরা কাছাকাছি কোথাও আছি, এই খবর পেলেই কর্পূরের মত সুন্দর গায়ের রঙ নিয়ে কর্পূরের মত কোথায় যে উবে যেত, তার ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে দুষ্ট লোকে বলত যে ওরা লড়তে এসেছে, মরতে আসে নি। ওরা দূর প্রাচ্যে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বুঝেছে যে, ধরা পড়া মানেই মরা। সে ভয়টা ওরা আমাদের কাছেও করে, যদিও তার কারণ ছিল না।

আমার প্ল্যাটুনটা সেদিন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে—পিছু-হটা লড়াই চালাতে চালাতে। অনেক চেষ্টা করলাম সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করতে। কিন্তু কে যে কোথা দিয়ে পালাতে বাধ্য হল তার ঠিক পেলাম না। সবচেয়ে মুস্কিল হল যখন রাত্রি হয়ে এল, তবু তাদের আজ পেলাম না। অথচ আমারি দায়িত্ব তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, পথ দেখিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আর এখন নিজেই পথ পাচ্ছি না।

এমন অবস্থায় আমার নির্দেশ ছিল যে, যতক্ষণ আবার আমরা এক সঙ্গে না মিলতে পারছি, পরস্পরের খোঁজ করব, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে চলব।—শত্রু যেন কোন সন্ধান না পায় বা না করে সন্দেহ। কাজেই রাত্রের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে খাবারের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন এমন বাড়িতে হাজির হই, যেখানে আদর করে খেতে দেবে—নিজের দেশের লোক বলে। দেশ স্বাধীন করতে এসেছি বলে, বিপদে ফেলব বলে নয়।

সারাদিন ওৎ পেতে থেকে ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক চালানো আর পাহাড়ী জঙ্গলে লুকিয়ে পিছু হটে আসার পর দলছাড়া হয়ে একা গ্রামে ঢোকা যে কতখানি দুঃসাহসের ব্যাপার তা কি আগে কখনও ভেবে দেখেছি ! বাঙ্গালী বেহিসাবী জীবনে বড় জোর কালবৈশাখীতে মেঘনায় পাড়ি দিয়েছি বা শেষরাত্রে বানডাকার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে লুকিয়ে নৌকার বাইরে এসে চরে ছুটাছুটি করেছি। এই তো হয়েছে জীবনের যা কিছু দুঃসাহসী অভিযান।

তারপর আরম্ভ হল কলকাতায় মেসের বারান্দায় সন্ধ্যা কাটানো। চাকরির সন্ধান সন্ধ্যায় শেষ করে পাশের বাড়ির রোয়াকের উপর কাঠের বানানো পানের দোকানে রেডিওতে শুনতাম—

মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।

তখন মনে মনে প্রিয়তমার বদলে চাকুরিদেবীর আবাহন করতাম। রাস্তার পুলিশই তখন বড় সাহেব। কি জানি কোন জায়গায় চাকরি পেলেও ওই কর্তাদের নেকনজর থাকলে সেটাও টিকবে না। অমন শান্ত নিরীহ জীবন কামনা করার পর এখন হঠাৎ এ কি পরিবর্তন হল আমার ! চকিতে গানটার কলি মনে পড়ে যাওয়াতে একটা প্যারডিও মনে এল—

মেশিন-গানেতে কয়ে যাবে কানে
প্রাণ নিয়ে তুমি ভাগিবে।

ভাগ্যের বিপাকে এই রকম অভাবনীয় অবস্থার মধ্যেই পড়তে হয়েছে তার মধ্যেও বড় আশার কথা এই যে, এত কষ্টের মধ্যেও মনের মৃত্যু কখনও হয় নি। পুরানো কথা ও প্রাণের ব্যথা দুই-ই এখন আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যখন সৈন্যদলে ঢুকে কুচকাওয়াজ করতে শিখি তখন ওরা বলত যে, ঠিক একভাবে তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন নিজের মন বা নিজের ক্ষমতা বলে কিছু থাকবে না। মার্চের তালেই আপনা থেকে দলকে চালিয়ে নিয়ে চলবে। ইটালীতে মুসোলিনীর "হংসপদিকার" দল সম্বন্ধে নাকি সে কথা আরো বেশী খাটে। 'গুজ্ স্টেপ' অর্থাৎ হংসগমন মুসোলিনী সে জন্যই সৃষ্টি করেছিল ফ্যাসিস্টদের জন্য।

সে কথা মনে হতেই আপনা থেকে মনে মনে বলে উঠলাম—হায় গজগামিনীর দল, তোমরা এবার কবিতার খাতা থেকে বিদায় নাও—আমরা সেখানে মার্চ করে ঢুকছি এবার।

বলতে বলতেই অন্ধকারে কাকে দেখলাম যেন! নীচু হয়ে বসে কান খাড়া করে ঘাড় উঁচু করে রইলাম। সত্যিই তো, একজন গজগামিনীই যেন মনে হচ্ছে। তাহলে তো খাবারের হদিশ হয়ে গেল। আহা বেঁচে থাক তোমরা অন্নপূর্ণার জাত।

কিন্তু বুঝিযে দিতে হবে যে খাবার দিতেই হবে। কেন, তাও বুঝিযে দিতে হবে। এত হযরাণ হযে রযেছি যে, আর ঘুবতে পারব না আজ রাত্রে।

"হল্ট, হু কামস্ দেয়ার ?"

পরিচিত কিন্তু পিলে-চমকানো এই হাঁক। তা শুনে গজগামিনী গজেন্দ্রাণীর মত স্থির হযে দাঁড়িযে রইল না। মুখ ফিরিযে দুঃসাহসে আমার দিকে এগিযে এল। যুদ্ধং দেহি ভাব দেখিযে সাহসিনী নির্ভীকভাবে আমায বলল,—হুঁ, ভাল ইংরেজী জান দেখছি! তুমি টমি?

এই হানা-হামলায তোলপাড় জঙ্গলে নারীকণ্ঠের ইংরেজী ইংবেজের হাওযাই হানার বোমার চেযে অনেক বেশী আশ্চর্য কথা। অন্য মনে কাঁধ থেকে ঝোলানো 'স্লিং'-এ রাইফেলটা আটকে রাখলাম।

নারী অন্ধকাবের মধ্যে নীরব বইলেন না। ইংরেজীতে আবার বললেন—এখান থেকে শীঘ্র চলে যাও—তোমাদেব লাইনে চলে যাও।

কণ্ঠে তাঁর আদেশেব সুব। আদেশ দিতে, মনে হচ্ছে, তিনি আজন্ম-অভ্যস্ত।

আমার মধ্যের সৈনিক তখন যুদ্ধসাজ আস্তে আস্তে সরিযে নিচ্ছে। এখানে ভয় বা হুমকিতে কাজ হবে না। সাধারণ মানুষের সহজ ব্যবহারই দরকার।

ইংরেজীতে বললাম—ম্যাডাম, আমি I. N. A.—আপনার কাছে আহার্য-প্রার্থী। আশ্রয় চাই না। খেযেই চলে যাব। চলুন আপনার বাড়িতে।

ম্যাডামের মনে কি ভাব হল বা মুখে কি ছাপ পড়ল তা অন্ধকারে বুঝবার উপায় নেই। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর বুঝিয়ে দিল যে, তিনি আমায় ভয় করছেন না।

আমার পরিচয় পেয়ে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মতলব কি? শুধু খাবেন তো?

আমার পক্ষে তাই একমাত্র কাম্য ছিল। ভোজনং যত্র তত্র চ কিন্তু শয়নং হট্টমন্দিরে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। যত গভীর বন হবে ততই আমার আর একটা দিন বেঁচে থাকার মেয়াদ বেড়ে যাবে। শুধু বেঁচে থাকা।

ব্যাকুলভাবে বললাম—হ্যাঁ, শুধু খাব। আর তখনি চলে যাব।

আমি খাবার পাঠিয়ে দেব। এখানে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করুন।

না, না, অপেক্ষা করতে বলবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই যাব।

দূরে তখনও এদিক সেদিক থেকে রাইফেলের গুলির আওয়াজ আসছে। বহু বহু দূরে হঠাৎ এক-একটা তীব্র সন্ধানী আলোর রেখা আকাশের বুক চিরে উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার জঙ্গলের গাছপালার ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফালি হয়ে ঢুকে আসছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে একটি টিলার তলায় শালবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। পিছু হটতে হটতে যে কোথায় এসে পড়েছিলাম তা টেরও পাই নি আগে। পেলে এদিকে আসতামই না।

কিন্তু যে দিকেই যেতাম ফল সেই একই। 'ছন'-বনের ও কাদার জলাগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গা ঘষে ঘষে আসতে আসতে কখন যে একটা জোঁক হাতের আস্তিনের ভিতর দিয়ে বগলে ঢুকে রক্ত চুষতে আরম্ভ করেছে তা এতক্ষণে টের পেলাম। ঘামে যে বগল ভিজে গিয়েছে, তা তো বুঝেই ছিলাম। কিন্তু সেটা যে শুধু ঘাম নয়, রক্ত—তা এতক্ষণে টের পেলাম। পোড়া কপাল! যে রক্তপাত শত্রু করতে পারল না, সেটা করে গেল একটা জোঁক। তখনও সেটার রক্ত-পিপাসা ও গা ফুলে যাওয়া শেষ হয় নি। জোরে টেনে বের করে আনতে গিয়ে ব্যথায় বলে উঠলাম—উঃ।

নারীটি ঘুরে দাঁড়ালেন,—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে। ঘুরে দাঁড়ালেন,—বললেন, আপনি বাঙ্গালী? পরিষ্কার বাংলা কথা।

সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ বোধ হয় এমনি আশার আলো এনে দেয় গর্জনমুখর ঝড়ের রাত্রে। বললাম—হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালী।

সারাদিন শত্রুর তাড়া খেয়ে আর খাবার না খেয়ে যা হয় নি এবার তাই হল।

তিন বছর মার্চ-করা, দুঃখে কষ্টে পোড়া, জাপানী বন্দী-শিবিরে ঘোরা আজাদ হিন্দ ফৌজের পলায়মান ক্যাপ্টেনের চোখে এই প্রথম জল এসে পড়ল।

(২)

না, আমার নামধাম জানতে চাইবেন না। শুধু জেনে রাখুন আমার নাম মঞ্জরী। রাজকুমার শীতলজিৎ সিংহের বান্ধবী।

রাজকুমার শীতলজিৎ? একটা সন্দেহ এল মনে। মণিপুর আক্রমণের সময় আমরা আগে থেকেই রাজপ্রাসাদের সবার নাম ও মনোভাবের খবর নিয়ে রেখেছিলাম। রাজপরিবারের মধ্যে শীতলজিৎ বলে তো কেউ ছিলেন না! সন্দেহে আমার পা আপনা থেকেই থেমে এল।

কিন্তু বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। যা সন্দেহ আছে তার নিরসন এখনি করতে হবে। যা বাধা তা এখনি দূর করতে হবে। জীবন ও মৃত্যু, স্বাধীনতা আর বন্দীত্বের মাঝখানে মাত্র একটি পদক্ষেপ বাকি।

দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু আপনি এখানে কি করে এলেন? এখানে কে কে আছেন তা আগে বলুন?

দ্বিধাহীনভাব বললেন—কেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না? ভয় নেই, বাড়িতে দুটি মণিপুরী ঝি ছাড়া কেউ নেই। তারাও রাইফেলের আওয়াজে এতক্ষণে গোবিন্দজীর নাম করতে করতে গুদামে গিয়ে নামাবলী মুড়ি দিয়েছে। আপনাকে ধরিয়ে দেবার জন্য কেউ নেই।

ততক্ষণে টিলার উপরে কুটীরের সামনে এসে পড়েছি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বললাম,—আগে সব শুনতে চাই, তার পরে ঘরে ঢুকব।

কঠোরভাবে মঞ্জরী প্রশ্ন করলেন,—অর্থাৎ?

অর্থাৎ জানতে চাই আপনি আমায় ধরিয়ে দেবেন কিনা! এখানে কি করে এলেন তা না জানলে সেটা বুঝব কেমন করে? সাধারণ যে-রকম মণিপুরী বাড়িতে আমরা রাত্রিতে চড়াও হয়ে যাই এটা তো সে রকম বাড়ি নয়। তার

উপরে বলছেন,—রাজকুমার! অথচ এ নামে কোন রাজকুমার মণিপুরে নেই। তাই সন্দেহ হয় বৈ কি। কিন্তু খাওয়া আমার নিতান্তই দরকার।

নেহাৎ এমন একটা অবস্থায় এসে পড়লেন মঞ্জরী দেবী যে বহু দ্বিধা সত্ত্বেও আত্মকাহিনী না বলে আর তাঁর উপায় রইল না।

আমি যখন ১৯৪১ সনে চাকরির সব পথে জুতো ঘষে ঘষে বিফল হয়ে সৈন্যদলে সেকেণ্ড লেফটনাণ্ট হয়ে ঢুকে সিঙ্গাপুরে চলে গেছি, তখন থেকে মঞ্জরীর কাহিনী হল সুরু।

তখনও যুদ্ধের ঢেউ বাঙ্গলা দেশের উপর বিশেষ এসে পড়ে নি। তারপর যে সময় সব ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আমি জাপানীদের হাতে বন্দী হলাম, তখন থেকেই ব্রিটিশ কর্তাদের শক্র বঞ্চনা নীতির সুরু হল। ফলে বাঙ্গলায় ভীষণ অন্নাভাব ও হাহাকার আরম্ভ হল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, লাখ লাখ লোক না খেতে পেয়ে শহরে এসে ভিক্ষা করতে সুরু করল। লাখ লাখ লোক অনাহারে মরে সারা হয়ে গেল—মড়কের মধ্যে শিযাল-কুকুরের মত। তার সঠিক খবর জানতাম না। আশ্চর্য হয়ে শুনতে শুনতে শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদেরই বিপদ হল সবচেয়ে বেশী। না করতে পারে ভিক্ষা, না আত্মরক্ষা। একদিন চাকরির খোঁজ থেকে ফিরতে গিয়ে পথে সৈন্যদের বিবিধ সরবরাহকারীদের হাতে পড়ে কোথায় যে বেচারী মঞ্জরী উধাও হয়ে গেল তা কেউ জানল না। আত্মীয় যারা তখনও বাকি ছিল, তারা কোন-দিন সন্ধান করে নি। এমন কি দেয় নি হয়তো খবরের কাগজে একটা মামুলী বিজ্ঞাপন। এদিকে ওই রাক্ষসরা ওকে এখান থেকে ওখানে গোপনে নানা অজানা জায়গায় চালান করতে লাগল। শেষে আসামে ডিমাপুর রেল স্টেশনের কাছে একটা সেনা-ছাউনীর কাছে এনে গুম করে রাখল। অবিরাম পাশবিক লাঞ্ছনার ফলে বেচারী প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। মানুষের কাছে শুধু পশুত্ব পেয়েছিল বলেই রাজকুমার শীতলজিৎ তাকে উদ্ধার করে আনার পরও সে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে যেতে রাজী হয় নি। সেখানেও যে বাঙ্গালী আছে, সমাজ আছে। রাজকুমারও চান নি তাকে সেখানে রাখতে। কোন-না-কোন দিন একথা রটনা হয়ে যাবে যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন কু-মতলবে একটি বাঙ্গালী

মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সত্যিকারের রাজকুমার নন, লোকসুবাদে রাজকুমার। মণিপুরে বহু বর্ধিষ্ণু লোকের রাজপরিবারের সঙ্গে কোন-না-কোন সম্বন্ধ আছে। তাঁরাও নিজেদের রাজকুমার বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

মঞ্জরী যেন এক নিঃশ্বাসে এতক্ষণ অতীতের সমুদ্র মন্থন করে যাচ্ছিল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিলাম তার কাহিনী। কখন যে তার কুটীরের দরজার সামনে থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি তার খেয়াল নেই। কিন্তু যখন তার বিবরণ নিজের কাহিনী থেকে রাজকুমারে এসে পেঁ ছল, কেবল তখনি নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। খুব ক্ষীণস্বরে বললাম—মাপ করবেন, আর শুনতে চাই না। আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করছি।

ম্লান আচ্ছন্ন কণ্ঠে মঞ্জরী বলল—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনি এখনি খেয়ে চলে যান। আমি আপনার সামনেই বসে থাকব। ভয় নেই যে বাইরে গিয়ে গোরাদের ডেকে আনবার চেষ্টা করব।

আলপনা-দেওয়া কাঠের পিঁড়িতে বসেই বুঝতে পারলাম যে, এই আসন ওর নিজের জন্যই তৈরী ছিল। নিজেরই খাবারটুকু দিয়ে আমার অতিথি সৎকার করবে। প্রতিবাদ করে বললাম—মঞ্জরী দেবী, আপনার খাবারটা আমি খেয়ে নেব না। শুধু একটু জল দিন।

পরিহাস—নিজের প্রতি পরিহাস-ভরা কণ্ঠে সে বলল—হ্যাঁ, দেবী, অবশ্যই দেবী! দানবের লুট করা দেবী!

চুপ করে রইলাম একটুক্ষণ। তারপর বললাম—শুনুন মঞ্জরী দেবী, আমি আর আপনি একসঙ্গে বসে খাব। আপনি আমায় খেতে দিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন। আমি জাতে বামুন। কাজে, ধরুন ক্ষত্রিয়। কিন্তু আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

নিজের মনেই যেন মঞ্জরী বলে গেল—হ্যাঁ, শ্রদ্ধা করি! নিজের প্রতি যে একটুও শ্রদ্ধা, একটুও পবিত্র ভাব বাকি নেই সেটা কি করে অন্য লোকে বুঝবে?

না মঞ্জরী দেবী, একথা বলবেন না। আপনি নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিতা—ইংরেজী যখন জানেন। একথা তো জানেন যে, বিপদ বা দুর্দৈব আপনাকে ছেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু ছোট করতে পারে না। এই নিন—এই বাটীতে আপনার জন্য ভাত তুলে দিলাম। চট করে খেয়ে নিন। আমারও দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

না, আপনি খেয়ে নিন। আমি তো প্রায়ই রাতে খাই না। রাত হলেই চারদিকে দুঃস্বপ্ন ঘিরে আসে—কালো কালো দুঃস্বপ্ন। পালিয়ে যেতে চাই ঘরের বাইরে। যেন তাতেই রক্ষা পাব। তাই তো জঙ্গলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ। ঝি দুটোর অভ্যেস হয়ে গেছে। ওরা জানে আমি রাতে খাই না, তবু রেঁধে রাখে রোজ।

কিন্তু আজ রাতে আপনি নিশ্চয়ই খাবেন। কাল তো আমি আসব না আপনাকে সাধতে!

হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল মঞ্জরী। আর্তস্বরে বলল,—অ্যাঁ! কাল গিয়ে বাংলা দেশে বলে বেড়াবেন যে আমি বেঁচে আছি, না, না, আমি মরে গেছি! মরে গেছি।

বুঝলাম যে, একমাত্র পথ হচ্ছে একে নিজের কথা ভাবতে না দেওয়া। অর্থাৎ আমার কথাই বলে যেতে হবে। কাল অবশ্য আমি থাকব না, তবু আজ রাতটুকু তো এ একটু শান্তি পাক। সেটুকুই হবে আতিথ্যের প্রতিদান।

সান্ত্বনার সুরে বললাম—মঞ্জরী দেবী, আমি তো বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি বর্মায় পালিয়ে। যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। এখন কোথায় যে লুকোব তা-ও জানি না। জাপানীর হাতে পার পেয়ে গেলাম, কিন্তু ইংরেজের হাতে রক্ষা নেই। ধরতে পারলে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বাপ-মার চোখের সামনে ফাঁসি দেবে হয়তো।

নিস্পৃহভাবে মঞ্জরী বলল—ঠিক কথা। আমারও বাপ-মা ছিল এককালে। কিন্তু তারা বেঁচে থাকলে এখন বোধ হয় আমায় মেয়ে বলে স্বীকার করতে চাইত না।

অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে যেন নূতন আলো পেলাম। চট করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, রাজকুমার আপনাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করেছেন। এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আপনি ওঁর সঙ্গে একবার দেশে ফিরে যান, আপনার গ্রাম সমাজ দশজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ওঁর সঙ্গে। রাজকুমারের স্ত্রীকে সবাই সম্মান জানাবে।

রাজকুমারকে এখনও ভাল করে চিনলাম না। ভদ্রলোক স্বপ্নবিলাসী

বোধ হয়। কিন্তু সংসারের বিশেষ কিছু বোঝেন না। কেন যে নিজের বিপদ ডেকে এনে আমায় এমন করে উদ্ধার করে আনলেন তা পর্যন্ত বুঝলাম না। ইম্ফলে বাঙ্গালী আছে বলে সেখানে যেতে রাজী নই। তাই স্বচ্ছন্দে আমায় এই দূর জঙ্গলে গ্রামের বাড়িতে রেখে গেলেন। কোন লোভ নেই, দাবি নেই আমার উপর। অথচ সবই দিয়ে যাচ্ছেন। আমি যে ওঁর কি, তাও হিসাব করে দেখেন নি।

অত্যন্ত সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলাম—কেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি আপনার সঙ্গে?

যখনই কথা তুলি, তিনিই বাধা দেন। বলেন—আমার মন এত ভেঙ্গে আছে যে, এ সম্বন্ধে কোন কথাই কওয়া ঠিক নয়। বলেন,—সময়ই সব সহজ করে ঠিক করে দেবে, এ সম্বন্ধে আমাদের ভাববার কিছু নেই। কিন্তু—

কিন্তু এর মধ্যে কোথাও নেই। আপনি দেখবেন সময়ই সব ঠিক করে দেবে।

কিন্তু উনি ভাবতে দেন না বলেই তো ভাবছি এত। নির্ভাবনার মধ্যেই তো ভাবনা বেশী। মাঝে মাঝে ভাবি—

কি ভাবেন? কই, আপনার বাটীর ভাত তো বাটীতেই রয়ে গেল। একেই তো ঠাণ্ডা ভাত—তাও শুকিয়ে গেছে। শীগগির খান বলছি।

রাগ করবেন না। খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু খেয়েই বা কি হবে? এ রকমভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কি?

মঞ্জরী দেবী, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই যুদ্ধটা কেটে যাক, আর দু-এক মাসেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন রাজকুমারের সঙ্গেই আপনার নূতন জীবন গড়ে উঠতে পারে। অথবা উনি আপনার জন্য এমন বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, যাতে আবার আপনি দেশে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিতে পারবেন।

বলতে বলতে মঞ্জরীর বিশাল বিষাদাচ্ছন্ন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনন্ত করুণতায় ভরা তার মুখের উপর দুটি চোখ। রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা আকাশের বুকে দুটি ম্লান তারা। তাদের ভাষা কে জানে?

মঞ্জরী মৃদু মাথা নেড়ে বলল—না, দেশ আমার শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আর যেতে পারি না। এবারকার মত জীবনের সব সাধও শেষ হয়ে গেছে।

তবু তো আমরা বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। এই দেখুন না, আমিও তো পালাচ্ছি, যদিও জানি প্রত্যেক দিনই আমার ধরা পড়বার কথা। পৃথিবীর কোথাও গিয়েই নিষ্কৃতি পাব না। আমেরিকানরা ধরতে পারবেই। তবু তা বলে লুকোবার চেষ্টা তো করতে হবেই। যুদ্ধ এখন শেষ হয় নি, কিন্তু বাঁচবার বাসনাতেই তো পিছু-হটা যুদ্ধ আমরা চালাচ্ছি। হয়তো তারি মধ্যে একটা কিছু পথ আবিষ্কার হয়ে যাবে। আপনিও তেমনভাবেই বাঁচতে চাইবেন মনে মনে, যতই না কেন জীবনে ধিক্কার আসুক।

না, মনে তো হয় না।

ভেবে দেখুন তো। এই গত ক-মাসের মধ্যেই এমন কিছু হয়ে থাকতে পারে, যা হয়তো আপনাকে বেঁচে থাকার সম্বল তৈরী করে দেবে।

চুপ করে রইল মঞ্জরী অনেকক্ষণ। অনন্ত স্মৃতি-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পরে তার মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে যেন বাণীর প্রকাশ হতে লাগল। আমি নির্মম আশ্বাসহীন পরাজয়ের বন্যার মুখে তাড়িত তৃণখণ্ড—সে বাণী কান পেতে শুনে যেতে লাগলাম।

মঞ্জরী বলে চলল—জানেন নিশ্চয়ই, বাংলায় কথা আছে যে, চোরের ধন বাটপাড়ের পকেটে যায়। সমাজের বুকে বসে থেকে পাপের যোগানদার তল্পি-বাহকরা যে কোথা থেকে কোথায় আমাকে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার সন্ধান কারও পাওয়ার সাধ্য ছিল না। ট্রেনে বা স্টীমারে কোন দিন তোলে নি আমাকে। শুধু রাত্রিবেলা হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় ট্রাকে করে নিয়ে যেত। পালাবার পথ নেই, আত্মহত্যা করবার উপায় নেই। ছিল শুধু অসহায়ভাবে সহ্য করে যাওয়া, চোখের জল মনের আগুনে শুকিয়ে ফেলা। তার মধ্যে একদিন হঠাৎ যে তাঁবুতে রাত্রে আমাকে চালান করা হয়েছিল, সেখানে কোন জরুরী কাজে ঢুকে পড়লেন এক মণিপুরী যুবক। হাতে তখনও খোলাই রয়েছে নিজের পরিচয়-পত্র (identity card)। ভদ্রলোক মহা অপ্রস্তুত হয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার সে রাত্রের কাপ্তেনের তখন কাণ্ডজ্ঞান একটু তাড়াতাড়ি

লোপ পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। কলির সন্ধ্যা কখনও কখনও সত্যি সন্ধ্যাতেই নেমে আসে। রাক্ষসটা ভদ্রলোককে খুব হৈ-হল্লা করে স্ফূর্তিতে ভাগ বসাতে নিমন্ত্রণ করল। বাড়িয়ে দিল একটা মদের গ্লাস। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ ছিল আমার দিকে—যে-আমার দিকে এত দিন ধরে কেউ স্বাভাবিক চোখে কখনও তাকায় নি। সে দৃষ্টিতে আমার চোখে জল এসে গেল। কাঁদবার যে অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম সে অধিকার যেন আমি ফিরে পেলাম। তিনি গ্লাসটা এক হাতে ধরে রেখে আর এক হাতে আমায় ইশারা করলেন কাছে এগিয়ে আসতে। জানি না কেন, একটু দুঃসাহস হল—এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। তাঁর পাশেই রাক্ষসটা ছিল, তবু তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি—ঘর-ভাঙ্গা, সর্বহারা, নিঃশেষিত আমি।

(৩)

সেই গভীর রাত্রে একটা জীপে করে চলেছি আমরা। সেই অচেনা মণিপুরী ভদ্রলোক আর আমি। রাত্রি অন্ধকার, তার চেয়ে বেশী অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে যাওয়া বাঁকাচোরা পথ। আমাদের সামনে পিছনে এমনিভাবে আরও বহু মোটর, জীপ ও ট্রাক চলেছে। তাদের সামনে কোন বড় বাতি নেই, শুধু দুটো সরু বিন্দুর মত আলো। দিনের আলোতে জাপানী বিমান-হানার সম্ভাবনার জন্য বিশেষ দরকার না হলে এ পথে গাড়ি চলে না। সন্ধ্যার পর সুরু হয় মণিপুরের পাহাড়ী পথে অন্ধ অভিযান।

আমি তখন অঝোরে কাঁদছি। আমি যেমনভাবে আপনাকে শুধু একটা কথা থেকে বাঙ্গালী বলে চিনে নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে তিনিও আমায় চিনে নিয়েছিলেন। সেই রাক্ষসটা কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। লালসায় লালা গড়িয়ে পড়ছিল তার জিভ থেকে। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে কি বললেন—জানেন? আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

তিনি বললেন,—জো, একে তুমি কোথায় পেয়েছ? এ যে আমার বহুদিনের হারানো পুরানো সুইট-হার্ট!

জো হেসে গড়িয়ে গেল। বলল,—গশ্, তোমার সুইট-হার্ট ! জান, একটা ইংরেজী কথা কইতে-পারা মেয়ে যোগাড় করতে কত টাকা খরচ হয়েছে ? তোমরা ইণ্ডিয়ানরা শুধু বিছানা চেন ; প্রেম করতে জান না। ফ্লার্ট করাই হচ্ছে প্রেমের প্রথম ভাগ। সেরা রস। সে সব তোমরা বুঝবে না। বাই জোভ, ব্লাইটি (ইংলণ্ড) ছেড়ে আসার পর একটু ফ্লার্ট করবারও মত মেয়ে পাই নি এই পোড়া দেশে এসে !

ভদ্রলোক ভয়ানক চটে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন,—জো, তুমি স্কাউন্‌ড্রেল। আমার হারানো সুইট-হার্ট, একে আমি নিয়ে যাব।

সহ্য করতে পারলাম না। বাঘের গহ্বর থেকে ভালুকের কবলে পড়তে যাচ্ছি কি না কে জানে ? লোকটি বেসামরিক আর চেহারায় ভদ্রলোক। কিন্তু বলছেন এ সব কি ? অসহ্য লাগল। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম—মা গো !

তখনি কিন্তু ভদ্রলোক সব বুঝে ফেললেন। বললেন—জো, আমার কলেজে পড়ার সময়কার বাঙ্গালী সুইট-হার্ট এখানে কি করে এল ? শীঘ্র বল, শীঘ্র। না হলে তোমায় মেরে ফেলব। এখনি যাচ্ছি রিপোর্ট করতে তোমার জেনারেলের কাছে।

আহত মানবতা যেন জেগে উঠল ওঁর স্বরে। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি দাপাদাপি করে সারা তাঁবুটা যেন চষে বেড়াতে লাগলেন। খালি বলতে লাগলেন—তোমরা জানোয়ার, আমার বাঙ্গালী প্রণয়িনী, কতদিন থেকে তার সন্ধান পাচ্ছি না। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর ওকেই। চাই না তোমাদের কণ্ট্রাক্ট, চাই না তোমার সঙ্গে বসে সন্ধ্যাবেলা মদ খাওয়া। যদি এখনি ওর জন্য বাইরে যাওয়ার পারমিট না দিতে পার, জেনারেলের কাছে নালিশ করব। এখনি নালিশ করতে যাচ্ছি। এখ্‌খনি। কোন কথা শুনব না। নো এক্‌স্‌প্লানেশনস্।

বিনা বাধায় বেরিয়ে এলাম। বিনা বাক্যে তাঁর জীপে উঠে বসলাম। কিন্তু বিনা অশ্রুতে তো আমার জীবন কাটবার নয়। কোথায় বা যাব এর পরে ? যাওয়ার জায়গা নেই, বাঁচবার উপায় নেই। সব চেয়ে বড় সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যা।

আমার কান্না অনুভব করতে পেরে ভদ্রলোক খুব সস্নেহে বাংলায় আমায়

জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি তো ছাড়া পেয়ে গেছেন, তবে কাঁদছেন কেন ? না, আমায় বিশ্বাস করছেন না ?

আরো বেশী কাঁদছি দেখে তিনি আবার বললেন,—শুনুন, কাঁদবেন না। আমি আপনার পারমিটে আপনার পরিচয় লিখিয়ে নিয়েছি আমার স্ত্রী বলে। প্রেমিকা এ পরিচয়ে তো ছাড়া পাওয়া যায় না। তাই 'জো' স্ত্রী এই পরিচয় লিখে দিয়েছে। এখন রাস্তায় প্রত্যেক খানাতল্লাশীর ঘাঁটিতে আপনাকে স্ত্রী হিসাবে চলতে হবে। তা না হলে কি হবে বুঝতে পারছেন তো ? আপনি তো মারা যাবেনই, আমারও ইতি হয়ে যাবে।

অনির্দিষ্টের জন্য আশঙ্কার চেয়ে অসত্যকে আশ্রয় করা ভাল। মনে মনে প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম যে, আমি ওঁর স্ত্রী, আমি ওঁর স্ত্রী। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হতে লাগল চিরকাল। প্রত্যেকটা ঘাঁটিকে মনে হতে লাগল বৈতরণী ঘাট। প্রত্যেকটা জায়গায় তিনি জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে পরম সস্নেহে হাত দিযে জড়িয়ে ধরে আমায নামিযে মিসেস্ শীতলজিৎ সিংহ বলে ঘোষণা করতে লাগলেন। প্রতি বার হাতে তুলে দিতে লাগলেন ফ্লাস্ক থেকে একটু জল বা টুকরি থেকে একটা ফল। পিছনে ঠেস দিযে বসার জন্য নিজের কোটটা দিলেন পাট করে। টাইটা খুলে গলার চারপাশে জড়িয়ে দিলেন, যেন ঘোমটা খুলে গিযে চুলের গোছা এলোমেলো না হয়ে যায়। স্বামিত্বে রইল না কোন খুঁত, অনুরাগের প্রকাশে কোন খাদ।

কিন্তু সেই ডিমাপুর-কোহিমার চল্লিশ মাইল পাহাড়ী পথের নিশীথ-অভিযান পর্যন্তই। তার পর থেকে তিনি আমার দিকে ভাল করে তাকিযে চান নি পর্যন্ত। অঙ্গস্পর্শ তো দূরের কথা। ইম্ফলে নিয়ে যেতে চাইলে যখন আপত্তি করলাম, বিনা দ্বিধায় এখানে রেখে গেলেন। বন্দোবস্ত করে গেলেন যাতে কোন অসুবিধা বা অভাব না হয। শুধু বলে গেলেন নিজেকে নূতন করে তৈরী করে নিতে, যাতে এদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দেশে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু ফিরবার আমার না আছে পথ, না মতি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জরী। অনেকক্ষণ তার কোন সাড়া না পেয়ে আমিই নীরবতা ভাঙলাম। বললাম,—বেশ তো, ফিরে যাবেন কেন ? বাংলা

দেশে তো আপনার কোন বন্ধন বা প্রয়োজন নেই। ইনিও বাংলা জানেন। মণিপুরীরা আহারে আচারে এমন কিছু অন্য রকমের লোকও নয়। যদি রাজকুমারকেই আপনি বিয়ে করেন আপনার তো কোনদিকেই অসুবিধা হবে না। চলে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে সেই কথাটাই ভেবে দেখবার জন্য বলে যাব।

ম্লান হেসে—এতক্ষণে প্রথম হেসে বলল মঞ্জরী—এইখানেই আপনি ভুল বুঝলেন। তিনি দিয়ে গেছেন এক রাত্রির অভিনয়। একজন অনাথাকে বিপদে দেখে তাকে উদ্ধার করে গেছেন। কিন্তু মিথ্যার মধ্যে যেটুকু মুহূর্তের সত্য ছিল তাকে সেটুকুর মধ্যেই রেখে দিতে হবে। তাকে টেনে বড় করা কি যায়? না, করতে গেলে তা টেকে?

আর দেরি করা নিরাপদ হবে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। শত্রুরাও অনেক দূরে ও অনেক দিকে খুঁজে এবার বোধ হয় আমার পথের দিকেই এগিয়ে আসবে। তবু মঞ্জরীর ইতিহাস এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, এখানে থামা যায় না। আমার তো পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা শীঘ্রই পড়বে। এর জীবনে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা তোলায় একটু সহায়তা আমি বাঙ্গালী হয়ে না করলে আর কে করবে?

বললাম—দেখুন, মানুষের জীবন অনেক দিনের কারবার। একদিন হঠাৎ যে আলো এসে পড়েছিল আপনার জীবনে, সেটা তখনি মিলিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো সেটা এত সত্য যে, আবার কোনদিন তার প্রকাশ হতে পারে এবং তারপর বহুদিন, হয়তো চিরকালের জন্যই, থেকে যেতে পারে। কাজেই আপনি এখনি কোন সিদ্ধান্ত করবেন না। আজ আপনার চারদিকেই অশান্তি। যুদ্ধ চলছে, লোক মরছে। এসব যখন কেটে যাবে, তখন দেখবেন বহু সমস্যাই সহজে মিটে যাবে। আপনি আর রাজকুমারও পরস্পরের প্রতি ভালভাবে তাকাবার সুযোগ পাবেন।

সবল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মঞ্জরী বলল,—না, তা হয় না। আর উচিতও হবে না। জীবনে বাবা-মা দিতে পারল না আশ্রয়। সমাজ করতে পারল না রক্ষা। দেশ করল না একটুখানি সন্ধান পর্যন্ত। ঠিক এক ফোঁটা জলের বুদ্বুদের মত আমি হারিয়ে গেলাম। আর যে একটু ক্ষণের জন্য করল স্বামিত্বের অভিনয়,

তাকেই সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থাকতে যাব ? কিসের দাবিতে ? কিসের জোরে ? সেই অভিনয়ের ক্ষণটুকুর সত্য কিসের অজুহাতে চিরকালের সত্য হয়ে থাকবে ? কি করে তাকে টেনে হেঁচড়ে রোজকার সংসারের মধ্যে নামাব ? না, তা হয় না।

তবে ?

তবে বলে কোন প্রশ্ন নেই। আমার কাছে কোন উত্তরও নেই। সেদিনের সেই ক্ষণটুকুতে যা আশ্রয় যা অবলম্বন পেয়েছিলাম, সেটাই স্বামিত্বের চিরকালের জিনিস। সেই আমাব চিরকাল। তার বাইরের জীবন আর সংসাব নিজেদের সামলে নিজেরাই চলতে পারবে। প্রত্যেক দিনের ঘরকন্নার মধ্যে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া চলবে না।

বলতে যাচ্ছিলাম যে, তাতে মানুষের চলে না। ভাবাবেগ অনুভবের দিক দিয়ে সত্য হলেও অবলম্বনের দিক দিয়ে অসার। সে কথা মঞ্জরীকে ভাল করে বুঝিয়ে যাওয়া দরকার। খুব ভাল করেই দরকার। আমি তো আমার দেশ আর সমাজকে চিনি। তাই ওকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভাবের ভেলায় ভবনদীতে ভাসা যায় না।

কিন্তু তার সময় হল না। দূরে ওরা তীব্র-সন্ধানী আলো ফেলে জঙ্গলের তলার আগাছাগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে আরম্ভ করেছে। যাকে বাঁচবার পথ বলে যেতে চাই, তাকে ফাঁসিয়ে গেলেও চলবে না। আমার যা-ই হয় হবে, তার চারা নেই। মঞ্জরীর তো অন্তত চিরকাল বলে একটা—অসার হোক, অসত্য হোক—একটা কিছু মানসিক আশ্রয় গড়ে উঠেছে। তারি ফলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলুক। কিন্তু আমায় এখনি সরে পড়তে হবে। যেন ওরা না ধরতে পারে যে মঞ্জরী আমায় খেতে দিয়েছিল। আমার জীবন এখনি এই মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করছে আমার পায়ের তলায়। ওর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকুক ওরই সেই চিরকাল।

বাসিফুলের বাস

হঠাৎ একটা মিষ্টি সেণ্টের গন্ধে ভরে গেল সারাটা মন।

ব্যারিস্টার মিস্টার রাকসিট খুব ভাল করেই চেনেন ওই সেণ্টটাকে। নাম হচ্ছে মিসচিফ। বাংলায় তার ঠিক মানে কি হবে? বম্বেতে এত বছর এক নাগাড়ে কাটিয়ে বাংলা ভাষাব সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ঘুচে এসেছে। গুজরাটি বলুন, মারাঠি বলুন, হিন্দী বলুন, কিছু কিছু পরিচয় হযেছে সে সব ভাষার সঙ্গে। কিন্তু বাংলা? না। রাকসিট সাহেব বহু বছর এদেশে আসেন নি। না হয়েছে সময, না তেমন চাড়। কাজেই মিসচিফ কথাটার কি মানে হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ভাষা-চর্চার চেষ্টা ছেড়ে তিনি পাইপ ধরালেন। যে মেমটি বম্বে মেলের এয়ারকণ্ডিশন কোচের টানা বারান্দা দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার চিন্তাটা অনেক সহজ, অনেক আরামের। ইংরেজী মিসচিফ কথাটার মানে যাই হোক না কেন।

তা মেমটির বয়েস হয়েছে নেহাৎ মন্দ নয়। চল্লিশের ওপারে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন ছিমছাম, গড়ন-পেটন কেমন নিটোল। টয়লেট ঘর থেকে বেরিয়ে এল যেন একটি রূপসী তন্বী তরুণী। হ্যাঁ, মিসচিফ মানে—মানে নষ্টামি নামের সুরভিটা ওকে মানায় বটে।

পাইপে আরও নিবিড়ভাবে একটা টান দিলেন মিস্টার রাকসিট।

হায, এই স্বাধীনতাটা এসে গিয়ে অনেক দিকেই লাভ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি "বি. এন. জি. এস"-এর দলও বিলেত না গিয়ে সাহেবী করবার চেষ্টা হালে ছেড়ে দিযেছে। কিন্তু খাস দেশী সাহেবরা দেশে বসেই যে সব বিলেতী রঙ আর ঢঙ, ক্লারা, মেরী, লুসিদের চারদিকে আনাগোনার সুখ পেতেন, সেসব তারা এখন 'মিস' করছেন। এসবের অভাব অনুভব করছেন।

সে জন্যেই মিঠে গন্ধটা আরও বেশী মিঠে লাগল।

মুছে গেল রাকসিটের নাকে প্রায়-লেগে-থাকা পানা পুকুরের এঁদো গন্ধ।

'লর্ড'কে অর্থাৎ ভগবানকে তিনি প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলেন।

তা লর্ডকে তিনি প্রায়ই ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন। এই তো খানিকক্ষণ আগেও দিয়েছিলেন। তখন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি হাওড়া স্টেশনের ভিড় ঠেলে কোন মতে বম্বে মেলের এয়ারকণ্ডিশন কোচে এসে উঠেছিলেন। বাঃ বাঃ, কি সাংঘাতিক অবস্থা এই বাংলা দেশের। এত নোংরা, এত হট্টগোল, চারদিকে ভাঙ্গা আর পুরোনোর ছড়াছড়ি। তবু কেন যে ইংরেজরা এই কলকাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলত তা তারাই জানে।

তার চেয়ে মিস্টার রাকসিটের ঘষা-মাজা, রাতদিন মুখে মেক-আপ করা বম্বে শহর অনেক ভাল। বেঁচে থাক তাঁর সমুদ্রের ওপর মালাবার হিলে বাড়ি—আর ফিরোজ শা মেটা রোডে চেম্বার।

নিজেও তিনি বাঁচতে চান। সেই বাঁচবার তাড়াতেই তিনি বি-এ পাশ করে কিছুদিন চাকরির দরখাস্ত লেখা মকৃশ করেছিলেন। কিছুই হল না অবশ্য। তারপর গাঁয়ের মামাবাড়ি থেকে বাপ-মা-হারা জীবেন রক্ষিত যে দিন কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল, সেদিন খুব বেশী হৈ-চৈ হয় নি বোধ হয়। অন্ততঃ বম্বের মিল অঞ্চলে যে অচেনা বাঙ্গালী যুবক মজুরদের চিঠিপত্র, মনি-অর্ডারের ফর্ম এসব দু আনা মাথাপিছু 'ফি' নিয়ে লিখে দিত সে কিছু টের পায় নি।

তারপর কেমন করে সে জাহাজে মাল হিসাবের চাকরি নিয়ে বিলেত গেল—সে কথা আজ মনে করার দরকার নেই। তার চেয়ে অনেক কম এলেম পেটে নিয়ে চাটগাঁ-শিলেটের লোক হামেসাই বিলেত ঘুরে আসে। এমনকি, 'ঈষ্ট এণ্ডে' অর্থাৎ লণ্ডনের গরীব পুব পাড়াতে ঘর-সংসারও পেতে বসে। দশ বছর পরে দেখা গেল ব্যারিস্টার মিঃ রাকৃসিট বিনা টাকায় বম্বেতে মজুরদের মোকদ্দমা লড়ছেন। রাকসিট সাহেবকা জিন্দাবাদ।

তারও প্রায় পনেরো বছর পরের কথা।

এই সাতাশ বছরের মধ্যে তিনি বাংলা দেশে আসেন নি। কেনই বা আসবেন ? মামারা বোধ হয় তাঁর গা-ঢাকা দেওয়াতে খরচ কমল বলে খুশিই হয়েছিলেন। এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েও যে ভাগ্নের কাছ থেকে দু মুঠো টাকার মুখ দেখা গেল না, সে বাড়িতে বসে আর ডেলি-

প্যাসেঞ্জারী করে দু বেলা অন্ন ধ্বংস করলে তাঁদের লাভটা কি ? আর গাঁয়ের বন্ধু-বান্ধবরাও ওর উধাও হয়ে যাওয়াতে দুঃখ করবে এমন মনে করার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু সেই গাঁয়েই তিনি আজ গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অকারণে। শুধু একটা খেয়ালে। হাড়ভাঙ্গা ঠিক নয়, তবে মাথা ঘামানো খাটুনির ফলে ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বললেন, হাওয়া বদলাতে হবে। বাইরের হাওয়া নয়, মনের হাওয়াও বদলাতে হবে। তাই তাঁর মানস হোম বিলেতের বদলে এবার এলেন বাংলা দেশে—মানে, কলকাতায়।

তা এই স্ট্র্যাণ্ড আর মেফেয়ার, চৌরঙ্গী আর আলিপুরে ঘেরা কলকাতায় রাকসিট সাহেবের মন্দ কাটে নি। তাঁর গুজরাটি মক্কেলের কলকাতার বাড়িখানা বম্বের অভাব মোটেই অনুভব করতে দেয় নি। কাজের দরকারে গেল বছর কয়েকের মধ্যে যে সব বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারাও লোক ভাল। বাংলা দেশের অতিথিকে ভালভাবে দেখাশোনা করেছেন।

তবু আজ সকাল থেকে মনটা এত খারাপ হয়ে ছিল! ঠিক খারাপ নয়, একটু যেন উদাস। রাকসিট সাহেব উদাস ভাবটা ঠিক বোঝেন না। তাঁর বন্ধুদের বললেন, কেমন একটা ব্লাজে (blase) বোধ করছেন তিনি। যে ভাবটা বাংলায় খুলে বলা তার কাছে সহজ নয়, ফরাসী কথাটা তার সবখানি গন্ধ, সবটা রূপ তার মনের কাছে তুলে ধরল। বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলেন যে, আজ কালকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেই যে এই উদাস ভাব তা নয়।

কিছু ভাল লাগছিল না। এই মেঘে ঢাকা মেঘ-ডাকা আকাশটা মানুষকে শান্তি দেবে না। সারা সকাল তার ভার তাঁর মনের ওপর চেপে ছিল। তাই তিনি লাঞ্চের খানিকক্ষণ পর চুপচাপ নীচে নেমে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে লম্বা ড্রাইভে নিয়ে যেতে বললেন। ভাল পিচঢালা রাস্তায় যেতে বললেন।

মোটরের চাকা জোরে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল মিস্টার রাকসিটের মনের চাকা। জোরে জোরে। শেষ পর্যন্ত দু পাশের পাটের কল আর কারখানার চিমনি তাঁর অসহ্য লাগল। তিনি ড্রাইভারকে কোন নিরিবিলি ছোট রাস্তায় মোটর নিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু আশ্চর্য —মাইল পনেরো যাবার পরই—এ তো চেনা রাস্তা মনে হচ্ছে। এখানে অবশ্য আগে মোটর চলার মত রাস্তা ছিল না। ছিল পায়ে হাঁটার, গরুর গাড়ি চলার মত সরু রাস্তা। হ্যাঁ, ওই তো খিলানওয়ালা দালান-বাড়িটা, ওই তো তার পিছন দিয়ে বাঁশঝাড়ে আড়াল করা দ্বাদশ শিবের মন্দির। তার নাট-মণ্ডপটাও দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ের প্রাণ ছিল এই জায়গাটা। তা হলে এখানেই নেমে একটু হেঁটে গাঁখানা দেখে নিলে মন্দ হয় না। বাংলা দেশে এসে কি কি দেখলেন তার গল্প হিসাবে বেশ মুখরোচক হবে।

বম্বের সমুদ্র পারে মেরিন ড্রাইভের ঠিক ওপরেই ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়াতে সান্ধ্য-আড্ডাতে এমন জমাট গল্প আর কেউ করতে পারবে না।

জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলেন রাকসিট সাহেব। সুশীল ও সুবোধ বালক ছিলেন না বলে যে-গাঁয়ে তাঁর কোন আদর ছিল না, সেখানে আজ খাস বিলেতের র‍্যাণ্ডাল কোম্পানীর তৈরী জুতো পরে মস মস করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

মন কিন্তু ঘুরতে লাগল সন্তর্পণে। না, তিনি এখানে কাউকে পরিচয় দিতে চান না। এখানে এমন কেউ তাঁর ছিল না যে সাতাশ বছর পরে আবার দেখা হওয়ার জন্য আনন্দে গলে যাবে। হাত ধরে তুলে এনে দাওয়াতে বসাবে। একটু হিংসা, একটু তেরছা প্রশ্ন না করে খোলা মনে সব কথা বলবে, জানতে চাইবে। বরং ভয় আছে যে পুরোনো দুঃখের আর বিপদের রোগ আর মরণের কথা শুনতে শুনতে ব্লাড-প্রেশারটা আবার বেড়ে যেতে পারে।

কাজেই তিনি অচেনা লোকের মত চুপিসাড়ে গ্রামটাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিজে কাউকে পরিচয় দেবেন না। সুট আর চোখের ওপর টেনে আনা হ্যাট তাঁকে ঢেকে রাখবে। কিন্তু আগের চেনা লোকদের হয়তো তিনি নিজে চিনে নিতে পারবেন।

কিন্তু কই কাউকে তো চেনা ঠেকল না। হাঁটতে হাঁটতে শিব মন্দিরের পিছন পর্যন্ত চলে গেলেন। লোক নেই। আরও দূরে যেখানে হাট বসত, সেখানেও কেউ নেই। ভিটেগুলো এখনও উঁচু হয়ে আছে, কিন্তু চালা নেই। সেখানে নিশ্চয়ই আর হাট বসে না। চাটুয্যে বাড়ির সামনের দরজায় তালা লাগানো।

JA BIR RI... 5736 ...
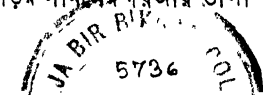
কিন্তু বাড়ির যা অবস্থা তাতে তালা লাগিয়ে রাখার দরকার যে কি তা বোঝা গেল না। আরও কয়েকটি বাড়িরও সেই অবস্থা। শুধু রামু ঘরামির ঘরগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে—ছাদ ধ্বসে গেছে বলে। ঘরই যখন নেই, তখন ঘরামিকেও দরকার নেই কারও—মনে মনে টিপ্পনী কাটলেন রাকসিট সাহেব।

একজন পশ্চিমাগোছের লোককে দেখা গেল। তাকে ডেকে তিনি গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন—আলগোছে, গা বাঁচিয়ে। যাতে তার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না ওঠে। পশ্চিমাও এখানে নতুন এসেছে। খালি বাড়ি-ঘর-জমি পড়ে আছে অনেকের। মাটি খুব ভাল ; ফসল পাওয়া সোজা। বি. টি. রোড়ের মেহেরবাণীতে কলকাতার বাজারে সব্জি পাঠানো খুব সহজ হয়ে গেছে। সে আরও দেশওয়ালী ভাই-বেরাদরদের এখানে এসে আস্তানা গাড়তে লিখেছে। বাঙ্গালী ভাইরা তো সব মালোযারীতে সাফা হযে গেল। গায়ে তাকত নেই ; মেহনতি করতে পারে না। ক্ষেতির কাম করবার লোক নেই। কেউ বা কলকাতায গিয়ে বাবুর কাম লিয়েছে। কাজেই মুলুক থেকে নতুন লোক এলে সহজেই পাট্টা গাড়তে পারবে।

তবে তো এখানকার ভবিষ্যৎ খুব ভাল ! পরিষ্কার হিন্দীতে বললেন রাকসিট সাহেব।

হ্যাঁ বাবুসাব। সবই এখানে ভাল। এই দেখুন না, আধ মাইল দুরে যে "রেফৌজি" কলোনী বসেছে, তারাও কেমন জঙ্গল সাফ করে সব্জী চাষ সুরু করেছে। ইয়া বড় টিউবওয়েল বসিয়েছে সরকার থেকে। এই গোটা এলাকাতেই রেফৌজি বসবার কথা আছে। তা হলে আর এমন হাল থাকবে না। আপনি কি কোন কলের সাহেব নাকি বাবুসাব ? তা হলে আমার একটা আর্জি আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়লেন রাকসিট সাহেব। কিন্তু যাবেন কোথায় ? এই পুরোনো ধ্বসে পড়া পানা-পুকুরের চাপা গন্ধ এড়িয়ে যাওয়া কি সোজা কথা ? পুকুরের ওপারে পচা গাছের গুঁড়ির সিড়ি বেয়ে জল নিয়ে উঠে আসছে কে ওই বুড়ী ?

থমকে দাঁড়ালেন রাকসিট সাহেব। কয়েক পা পেছিয়ে এলেন। একটু দাঁড়িয়ে আবার ভাল করে তাকালেন সেই নারীমূর্তির দিকে। নজর করে দেখতে লাগলেন তার চলন, তার ঘাড় দোলানো, তার কলসী ধরার ভঙ্গি। দেখতে লাগলেন আর চোখের ওপর টুপিটা আরও একটু টেনে দিলেন।

ব্লাড-প্রেশারটা যেন একটু একটু করে আবার বেড়ে যাচ্ছে।

এই সব পুরোনো কথা, ভুলে যাওয়া স্মৃতি—এগুলো অত্যন্ত খারাপ জিনিস। কেবল অস্বস্তি এনে দেয়। পিছু টান দেয়। মনে করিয়ে দেয় যে, এককালে আমিও ছিলাম এমনি তুচ্ছ, নড়বড়ে। হ্যাঁ, এই গাঁখানারই মত মরচে-পড়া। ভবিষ্যতহীন। তার চেয়ে এই অচেনা পশ্চিমা, এই নতুন গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনী ভাল। এদের বর্তমানটা কাজে ভরা ; ভবিষ্যতটা আশায়।

সেজন্যই তিনি সাতাশ বছর ধরে বম্বেতে প্রবাসী। মুছে ফেলেছেন তাঁর মন থেকে ওই ভাঙ্গন-ধরা গ্রাম, শিকড়-ছেঁড়া অতীত। কলকাতায় শুধু নিজের, মানে মিস্টার রাকসিটের, সমান ওজনের নতুন বন্ধুদের সঙ্গেই করেছেন মেলামেশা।

এই অম্বালী ছিল তাঁর গ্রামের স্বর্ণলতিকা। সোনার মত বরণ, লতার মত গড়ন। মাইকেলের কবিতা ছিল গ্রামের মধ্যে ফ্যাশান। "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে।" স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে লাইনটা সারা গ্রামে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সদ্য বি-এ পাশ করা জীবেনের মনেও গেঁথে ছিল এই স্বর্ণলতিকা। এই অম্বালী।

কিন্তু কোন্ রসালের কপালে জুটবে এই সোনার বরণ লতা ? সে জানত যে অম্বালীকে বিয়ে করার লোকের অভাব হবে না। তার বাপ-মাও জানত। বিয়ের বহু সম্বন্ধ আসছিল দূর আর কাছ থেকে। কাজেই বেকার তরুণের এ অবস্থায় কোন আশা ছিল না। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, যাতে বিয়ে করতে চাইবাব মত সামান্য একটু অধিকার তৈরী করতে পারে। যদি কপাল গতিকে একটা চাকরি জুটে যায়, মামাবাড়িতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অম্বালীকে পাওয়া অসম্ভব হয়তো হবে না। কিন্তু অল্প বয়সের ভীরু প্রেম সে কথা কাউকে খুলে বলতে পারে নি। এমনকি অম্বালীকেও না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অম্বালীর বিয়ে হয়ে গেল। নিজেদের গ্রামেই। ঘরে-বরে সব দিকেই ভাল পাত্র। সবাই খুশি। হয়তো অন্যান্য আরও তরুণের মনে অম্বালীর জন্য ঢেউ উঠেছিল। সে খবর তাদের নিজেদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাইরে কেউ জানবার কথা নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে দল বেঁধে মুখ বুজে ঠোঁট চেপে জীবেনও পরিবেশন করে গেল সমান দৌড়াদৌড়ি করে।

নতুন কনে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর সন্ধ্যাবেলায় জীবেন একবার এসেছিল অম্বালীদের বাড়ির কাছে। এই পুকুরেরই পাড়ে। তাতে ছিল টলটলে জল; নিজের চোখের জলের মত। ঝাপসা চোখে পাড়ে জমানো বাসি ফুলের রাশি দেখতে দেখতে খুব আস্তে আস্তে সে চলে গেল। গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। তার আগের দিন পর্যন্ত সে ভাবে নি যে এমন একটা কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। তার জন্য কারও কোন মাথাব্যথাও ছিল না।

সে দিনের তুচ্ছ জীবেন কারও কাছে দাবি জানাতে পারে নি। করে নি কোন অভিযোগ। দাবি করবার ক্ষমতা ছিল না। ছিল না নালিশ করবার মুখ। কিন্তু কেন সে তা করে নি? কেন চোরের মত পরাজিতের মত সে সরে পড়ল? বেকার হয়ে ব্যর্থ হয়ে বসে থাকা বড় শক্ত। সবাই তার কথা ভেবে 'আহা' করবে, সে কথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তার ওপর এটা হল নতুন একটা হার। যদি সেই পালানোর মত দুঃসাহসী কাজই করতে পারল, কেন সে পালাবার আগে দুঃসাহস দেখিয়ে অন্তত তার স্বর্ণলতিকাকে অন্য কোন গাছে তুলে দেবার দিন পেছিয়ে দিতে অনুরোধ করে নি? যে ধাক্কার চোটে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ধাক্কা কেন তাকে ঘর গড়বার জন্য আরও বেশী চেষ্টা করাল না? না, সে প্রশ্ন এখন তুলে তিনি নিজের আলোয়-ভরা বিকেল বেলাটাকে মেঘলা করতে চান না।

বম্বে মেল অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে এল। মিস্টার রাকসিট নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। আজ বিকেলের ওই হঠাৎ খেয়ালে মোটর-ড্রাইভটা তার মনকে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিল। ওই পচা পানা-পুকুর, পোড়ো তালাবন্ধ বাড়িঘর, ভাঙ্গা শিবতলা—তার পুরোনো অতীতের মুছে যাওয়া ছবি। কিন্তু সে ছবিকে তিনি মেরিন ড্রাইভের পারে ক্রিকেট

ক্লাব অব ইণ্ডিয়াতে লাউঞ্জে বসে তার সাহেব কোম্পানীর আসবাবে সাজানো বাড়ি, রেডিও বসানো ক্রাইসলার গাড়ি আর প্রত্যেক গরমের ছুটিতে 'হোমে' পাড়ি দেওয়া এ সবের ঝক্‌মকে ছবির পাশে এনে দাঁড় করাবেন না। ওই শিবতলাতে দাঁড়িয়েই মরে যাওয়া গাঁয়ের চেয়ে নতুন গড়ে ওঠা রেফিউজি কলোনীর দিকে তার নজর গিয়েছিল বেশী। পানায় ঢাকা পুকুরের চেয়ে নতুন আবাদ করা ফসলের খবরই তার মনে ধরেছিল। তিনি নিজে তার বেকার অসহায় জীবনের উপর জয়ী হয়েছেন। তার পুরোনো গ্রামের পরাজয়ের ক্ষেত্রে তাই র‍্যাণ্ডালের তৈরী জুতো মস্ মস্ করে দাপটে হাঁটাহাটি করেছেন। আজ সবটুকু গ্রাম হেরে গেছে, চোখ বুজে মরার মত পড়ে আছে। জীবেন হেরে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মিঃ রাকসিট আজ জয়ী।

কিন্তু সত্যি কি তাই, জীবেন? পাইপের ধোঁয়াটা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যি কি তাই? তুমি আজ মিস্টার রাকসিট সেজে নিজেকে জয়ী বলে ভাবছ। এমন কি আজ ইচ্ছে হলে তোমার টাকা আর প্রভাব দিয়ে এই গ্রামটাকে নতুন করে গড়ে দিতেও পার, কিন্তু ওই যে তোমার স্বর্ণলতিকা, তোমার অম্বালী? তাকে তুমি কি আবার ফিরে পেতে পার? পার নতুন করে তাকে স্বাস্থ্যে রূপে সার্থকতায় ভরে তুলতে? ইচ্ছা করলে তুমি পুকুরের শ্যাওলা তুলে নতুন টলটলে জল তাতে ভরে দিতে পার। কিন্তু ম্যালেরিয়া, অপথ্য আর গেঁয়ো আবহাওয়ায় অম্বালীর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া জীবনে যে শ্যাওলা পড়ে গেছে তা থেকে কি পার ওকে বাঁচাতে?

না। তোমার হারই হয়েছে মিস্টার রাকসিট। তোমারই হার হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম সাগরের হাওয়ার দোলায় মাথা ঠাণ্ডা ব্যারিস্টারের হার হল না। অম্বালী? আজ যাকে পুকুরপাড়ে দেখলাম সে তো সেই অম্বালী নয়। মানি যে সেই মানুষই বটে, কিন্তু সে অম্বালী নয়। তার মধ্যে হয় নি আমার কোন পরাজয়। অবশ্য তার কথা মনে পড়ে আজ খুশিই হয়েছি। বেশ ভালই লাগল। সে হচ্ছে শুধু বাসি ফুলের বাস।

এই মিসচিফ সেণ্টটারই যত নষ্টামি। পাইপটা মুখে চেপে ধরে মিস্টার রাকসিট হাল্কা নীল কাঁচের সাশির উপর প্লাস্টিকের পর্দাটা টেনে দিলেন।

বৌদি

এ-রকম অঘটন আমাদের দেশে বড় একটা শোনা যায় না। তবে লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড হাথ বাগানটা যেন জাদুতে ভরা। ওখানে মাইলখানেক চওড়া আর তার চেয়ে লম্বা বাগানটা ঝোপ-ঝাড়-টিলা দিয়ে সাজানো। গরমের দিনে তাতে পুকুরে সাঁতার কাটে হাঁস। শীতের দিনে তার বুকে জমে যাওয়া বরফে তরুণ-তরুণীরা করে স্কেটিং। বেহেস্ত অবশ্য চোখে দেখবার নসীব নিয়ে জন্মাই নি, কিন্তু হ্যাম্পস্টেড হীথই আমার পক্ষে যথেষ্ট—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন নির্মলদা।

নির্মলদা কেন যে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে বছরের পর বছর একাটি পড়ে আছেন তা বুঝি না। পেটে অঢেল বিদ্যা। আর এখানে বড় কোম্পানিতে একাউন্টেন্সী করে এমন হাত পাকিয়েছেন যে, দেশে ফিরে গেলে যে-কোন সাহেব কোম্পানি ওঁকে লুফে নেবে। এখানে তিনি কোন শিকড়ও গাড়েন নি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দহরম-মহরমে চৌকস লোক।

কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে চাপা। হাঁড়ির খবর তো দূরের কথা, হাঁড়ি আছে কি না তারই দিশা পেল না কেউ এ পর্যন্ত।

এই ধরুন, শনিবার রাতে নটার সময় পিয়ন হোম মেল অর্থাৎ দেশের ডাক বিলি করে গেল। শুধোলাম—কি দাদা, বৌদির খবর কি?

দাদা হাসিতে গলে গিয়ে বললেন,—দারুণ বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন। এবার বাংলা দেশে সে জন্যেই গরম এত বেশী!

তাহলে এই মিঠে 'মে' মাসটা চলছে—"বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া"— বৌদিকে আনিয়ে নিন না লণ্ডনে! পাশের ডবল-রুমটা আপনাদের জন্য ছেড়ে দেব। আপনারও সুখ, আমাদেরও দু এক দিন রোষ্ট-মাটন আর বয়েল্ পোটাটোর হাত থেকে রেহাই হয়!

দাদা আপোষ করেন সে দিন কাফে হিন্দুস্থানে ভাত-মাছের ঝোল খাইয়ে। কিন্তু বৌদির অস্তিত্বের উপর থেকে ঘোমটাটা আর খোলে না।

পনেরো দিন কারখানা ছুটি। দাদা চলেছেন কন্টিনেন্টে বেড়াতে। কি দাদা, বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে একাই? না, সিংকিং সিংকিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার? আমরা কিন্তু স্পাই লাগিয়ে রেখেছি, জানিয়ে রাখলাম।

দাদা আবার হাসবেন। সংক্ষেপে বলবেন, জানই তো, শাস্ত্রে লিখেছে, পথি নারী বিবর্জিতা। আত্মনেপদী আর পরস্মৈপদী দুরকমই।

আমাদের রক্ত গরম, মুখেরও লাগাম নেই। ফস করে বলে বসি—এ গার্ল ইন এভরি পোর্ট—প্রত্যেক বন্দরেই বুঝি আপনার আস্তানা আছে?

পূর্ব-বাংলার ওস্তাদ ছেলে দাদা। সাফ জবাব দিলেন—ঘাটে ঘাটে নাও বাঁধাই হচ্ছে বাহাদুরি। তবে আমার নাও লাগে না, ডুব-সাঁতার মক্স আছে। বলেই এমন একটা তেরছা চাউনি চালালেন যে, তিনি যে পাঁড় 'লেডি-কিলার' সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নির্মল গুহ-রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের কোন হদিস পাই নি। আমাদের চেয়ে অন্তত দশ বছর আগে বিলেতে এসেছেন, কিন্তু চালচলন আমাদেরই মত অল্পবয়সী। আমরা কাজ ফুরোলেই কবে দেশে ফিরব তার দিন গুণি। কিন্তু উনি দেশ যে একটা আছে, সে কথাও ভুলে গেছেন মনে হয়। বৌদি ব্যাপারটা নেহাৎ রূপকথা, না সত্যি কোন বাঙ্গালী বৌ দেশে বসে নির্মলদার ফিরে আসার দিন গুণছেন, তার সঠিক খবর কেউ জানে না। তবে সবাই জানে যে, তিনি মেয়েদের ধার-কাছ দিয়েও যান না।

সম্ভবত বৌদি সৃষ্টি হয়েছিল সেই জন্যই। বয়সকালে হয়তো তিনি ফূর্তি করতে বের হতে রাজী হতেন না। বন্ধুরা জোর-জবরদস্তি করায়, দেশে বৌদি আছেন এই কারণ দেখিয়ে দড়ি-ছেঁড়া জীবনকে এড়িয়ে গেছেন। হয়তো বৌদির প্রতি ধর্মে অবিচল আছেন বলেই দাদা মেয়েদের সঙ্গে মেশেন না—এই কারণ অল্পবয়সীরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে।

এ হেন নির্মলদা একটা নারীঘটিত অঘটনে জড়িয়ে পড়েছেন।

রাত প্রায় দশটা। বিলেতের মাতাল-করা বসন্তকাল। পড়ায় মন বসছে না। পরীক্ষা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বসন্ত জানালায় এসে উঁকিঝুঁকি মারছে অনুক্ষণ। লম্বা সন্ধ্যাগুলো আলোয়-ভরা। রাত নটার সময়ও

পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে পড়তে মন বসাতে পারি না। বিরক্ত হয়ে উঠে ভাবলাম যে, তার চেয়ে বই ছেড়ে বাড়িতে চিঠি লিখতে বসা যাক। তার ফলে হয়তো পড়ার চাড় ফিরে আসবে। এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

ব্যাপার সাংঘাতিক! দাদা নাকি এই রাতে হ্যাম্পস্টেড হীথের এক নিরালা আঁধার কোণে বেঞ্চিতে বসে একজন মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলেন। এমন সময় এসে হাজির হল তার স্বামী আর স্বামীর এক বন্ধু। দাদা পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুলিস এসে পড়ে। পুলিস দু পক্ষকেই থানায় নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে এই ফোন।

মাথা ঘুরে গেল আমাদের। শেষকালে দাদার যদি বদনাম হয়, এ কাহিনী খবরের কাগজে বেরোবে। এদেশে কেচ্ছার কথা লোকে 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' মনে করে পড়ে। চারদিকে সবাই তাকাবে আমাদের দিকে, আর মনে মনে ভাববে, 'এই চলেছে আরেক ব্যাটা ইণ্ডিয়ান'।

নাঃ। দাদা যে নির্দোষ তা জানি; কিন্তু ওকে বেকসুর খালাস করে আনতে হবে। দলে-দলে চললাম থানায়। সবাই সাক্ষী দেব দাদার চরিত্র সম্বন্ধে। মামলাটা থানার খাতায় রিপোর্ট দাখিল হওয়ার আগেই উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিলেতে পুলিসী আইন-কানুন এত ভাল যে, একজন অফিসার ব্যাপারটা তলিয়ে না দেখা পর্যন্ত থানায় হুট করে কোন নালিশ খাতায় টুকে নেয় না।

দেখি, দাদাকে একটা ঘরে 'ইনটারোগেশন' করা হচ্ছে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে অন্নপ্রাশনের ভাত থেকে কুষ্টি-ঠিকুজী সবকিছুর হিসাব নিচ্ছেন একজন অফিসার। অন্য পক্ষকেও পাশে আর একটা ঘরে এই রকম ভাবে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে।

আপনারা নির্মাল গিউহারের বন্ধু? এই দেখুন তার জবানবন্দী।

মিস্টার গিউহারে অর্থাৎ গুহ-রায় সাহেব তার রোজকার অভ্যাস মত ডিনারের পর হ্যাম্পস্টেড হীথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরবার আগে রোজকার মতই বাঁধা একটা বেঞ্চিতে বসে সিগারেট খাচ্ছেন, এমন সময় একটি তরুণী মেম তার পাশে এসে বসল। ভদ্রতা করে সে আগে থেকে বসা

ভদ্রলোকের অনুমতিও নিয়েছিল। তারপর আরও ভদ্রতা করে বিদেশী দেখে তাকে সিগারেটও 'অফার' করেছিল। ক্রমে ক্রমে সে দাদার কাছে একটু একটু করে সরে আসে। কথাবার্তার মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠতার সুর জমিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ফস করে সে-ই দাদাকে জড়িয়ে ধরে একটু চুমু খেয়েছে, গাছের আড়াল থেকে কে ফ্লাস-লাইটে ছবি তুলে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু জন গাট্টাগোট্টা লোক এসে দু জনকেই পাকড়াল। তার পরের ব্যাপারটা বোঝা শক্ত নয়। ওদের নালিশ যে মেয়েটিকে দাদা ফুসলোচ্ছেন বেশ কিছুদিন ধরে। দাদার পাল্টা নালিশ হচ্ছে যে, ওরা নিশ্চয়ই অনেক দিন ওর গতিবিধি নজর করে টাকা আদায়ের একটা চক্রান্ত করেছে। ওরা খুব চোটপাট করে টাকা দাবি করেছিল। না দিলে সাক্ষী-সাবুদ নিযে থানা-পুলিস করবে ; ছবি দেশের ঠিকানায় পাঠিযে দেবে, এমন কত কি।

ওদিকে পাশের ঘরেও 'ইনটারোগেশন' চলছে। মেযেটার নাকি-সুরে কান্নাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। ও-পক্ষের জবানবন্দী শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

আমরা ফিস ফিস করে বললাম, দাদা, শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে না কি? বৌদি কি ভাববেন!

অফিসারের কান খাড়া হযে উঠল। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, —আপনারা কি কথাবার্তা কইছেন? হোযাট ইজ ব্যাডি? খারাপ কিছু না কি?

বুঝলাম বৌদি কথাটার সঙ্গে ইংরেজী ব্যাডলির একটু আওযাজের আদল আসে বলে তার কানে ঠেকেছে। বললাম বৌদির রহস্যের কথা। অফিসারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এনকোয়ারির জন্য য়্যান্টিসিডেণ্টের দরকার হয়। অতীত জীবন-কথা তদন্তের জন্য দরকার।

কাজেই সে দাদার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা জানতে দাবি করল। কিন্তু সরকারী পোশাকী কায়দায় নয়। গরম কফি আনাল। রাত-দুপুরে আরাম করে আমরা টেবিল ঘিরে বসলাম। দাদা অফিসারের মুখোমুখি। সাদা মুখে তার নোট করবার লাল পেন্সিলটা গোঁজা।

দাদা তখন বাংলা দেশের এক জেলা শহরের ছাত্র। বি-এ পরীক্ষায় অঙ্কে অনার্স দিয়েছেন। প্রথম হবার আশা আছে। ব্যবহারে চাল-চলনে একেবারে নিখুঁত। চেহারাটা অবশ্য মেয়েদের প্রাইভেট টিউশানি করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কিন্তু টিউশানিতে ভাল পড়ানোর জন্য সুনাম ছিল। তাই সেই শহরেই এক রাজকুমারীকে বাড়িতে পড়ানোর কাজ জুটে গেল। গরীবের ছেলে। টিউশানি করে যখন খরচ চালাতে হয়, তখন রাজবাড়িতে বেশী মাইনের কাজই সুবিধা।

আত্মকাহিনী বলতে বলতে দাদা একটু গরম হয়ে উঠলেন। চার্টার্ড একাউন্টেন্টের হিসাব-কষা মনে কোথা থেকে কবিতা জেগে উঠল এমন। দাদা ব্যাকুলভাবে অফিসারকে বললেন,—তোমাদের কবি শেলী লিখেছেন—'দি ডিজায়ার অব দি মথ ফর দি স্টার'। আকাশের তারার জন্য ভূঁইপোকার আকুতি। কিন্তু সে জিনিসটা কি তা তোমরা এই ঠাণ্ডা দেশের লোকরা বুঝবে না।

সাত ফুট লম্বা তাগড়া পুলিস ভদ্রলোকের চোখে ঝিলিক্ খেলে গেল। বলল,—তা 'কাফলভ' অর্থাৎ এঁচোড়ে-পাকা প্রেম আমাদের দেশেও হয়ে থাকে। তবে সে প্রেম সাধারণত বাড়তে পারে না। কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝরে যায়।

ব্যথা পেয়ে দাদা বললেন,—না, এ তোমাদের কচি ও কাঁচাদের পিরীতি নয়, রীতিমত মারাত্মক অবস্থা। ভেবে দেখ, আমি পড়ি বি-এ। বাড়িতে চাল-চুলো নেই, নেই মুরুব্বির জোর। এক ভরসা, যদি স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতে আসতে পারি। একুশ বছর বয়সে অঙ্কের ছাত্র হয়ে কিনা ভালবেসে ফেললাম এক ডাকসাইটে রাজা-জমিদারের কলেজের জন্য প্রাইভেট-পড়া মেয়েকে? তার পাঁচ-মহলা রাজবাড়ির সারি সারি দেওয়ালের ওপারে গিয়ে?

পুলিসেরও প্রাণে বেশ রস আছে দেখলাম। বলল—তা চায়না থেকে পেরু পর্যন্ত সর্বত্রই মেয়েদের ভালবাসা চলে। অবশ্য সিংহের গুহায় ঢুকে……

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বললেন—তা সত্যিই সিংহের গুহা। তবে সিংহ তো একটি নয়, গণ্ডায় গণ্ডায়। শুধু রাজপরিবারের লোকরাই নয়, প্রত্যেক দেউড়ির গুর্খা সিপাইগুলোর নাম পর্যন্ত সিংহ; সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। তবু, জান অফিসার, এমন একটা দুঃসাহসী বোকামি করলাম!

আবার তাজা কফি ঢালা হল পেয়ালায়। চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে সাত ফুট বলল—তা দেখ, আমাদের দেশে প্রেম করাতে বাধাও কম, বিপদও কম। লর্ডের মেয়ের সঙ্গে 'কমনারে'র প্রেম হলে তার গর্দান যাবার ভয় থাকে না।

কিন্তু আমাদের দেশে থাকে। বিশেষ করে রাজা-জমিদারদের ঘরে। অবশ্য আমাদের প্রেম লোকের মধ্যে জানাজানি হয় নি। আমার সুইট-হার্টও ছিল খুব সাবধান। আর আমরা কোন দিন অসম্ভব আশাও করি নি। তবু বিপদ হল যখন তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল, আর সে সাহস করে তার মাসীমাকে জানাল যে, প্রাইভেটে বি-এ পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়ে সে বিয়ে করতে একেবারেই রাজী নয়।

তোমাদের দেশে তো শুনেছি একেবারে হাল-ফ্যাশানের বাড়ি না হলে মেয়েদের বিয়েতে মতামত নেওয়া হয় না।

গলার টাইটা একটু আলগা করে নিলেন দাদা। মানসিক উত্তেজনায় তাঁর যে অস্বস্তি হচ্ছিল তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। তিনি বললেন,—সেই জন্যেই তো বিপদ হল। রাণী—হ্যাঁ, যদিও সে রাজকুমারী, তাকে রাণী বলে ডাকতাম—যদি চুপচাপ থাকত তাহলে বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি না হওয়া পর্যন্ত কেউ বোধ হয় টের পেত না। কিন্তু সে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আগে থেকেই তার আপত্তি জানিয়ে দিল। মেয়েরা এই রকমই। তাদের দেহকে বন্দিনী করে রাখতে পার, কিন্তু মনকে নয়। অবলার মনের বলের কাছে পুরুষ চিরকাল হার মানে।

আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু মেমদের ভালবাসার পথে এ রকম মুস্কিল সহজে হয় না। স্বাধীন ইচ্ছার সম্মান আমরা রাখি।

দাদা আর সইতে পারলেন না। একটু জলে উঠে বললেন,—সেই জন্যেই তো আমাদের অন্দরমহলে যখন প্রেম জাগে সে প্রেমের দাম অনেক বেশী। আমিও তাই আমার সব ভয়, ভবিষ্যৎ ভুলে রাণীর ভালবাসায় সাড়া দিলাম। জানতাম, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সে হয়তো একদিন আস্তে আস্তে নিজেকে সংসারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তা বলে তার কিশোর মনের প্রেমের

সত্যতা একটুও কমে যাবে না। কিন্তু আমার মন তো পেকে গিয়েছিল; তার উপর সংসার আর কোন নতুন রঙ চড়াতে পারবে না। তবু সব বুঝে সব জেনেশুনে ভালবেসেছিলাম।

একদিন রাণীকে বললাম যে, বিয়েতে রাজী না থাকার কথা তার মাসীকে জানানোর পর থেকেই আড়ালে আড়ি-পাতা, উঁকিঝুঁকি মারা এ সবের বন্দোবস্ত হয়েছে বলে টের পেয়েছি। অতএব একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। রাণী ক্ষেপে গেল। বলল, জমিদার-ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। জেলখানা থেকে কয়েদীদের একদিন ছাড়া পাবার আশা থাকে, আর আমার কি কোন আশাই থাকবে না, একদিন তোমার হাত ধরে তোমার স্বাধীন ঘরে গিয়ে উঠবার? আমি আজই রাণীমাকে সব খুলে বলব। একেবারে কিছু ঢাকব না। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। মোকাবিলায় একেবারে সব সাফসুফ হয়ে যাক। দেখি, কে আমায় রুখতে পারে?

আমাব অন্তর কেঁপে উঠল। ওই দেউড়ির দরোযানদের ভয়ে নয়, সিংহের বন্যার শিয়ালের গর্তে বাসা বাঁধবার সাহস দেখে। তার হাত চেপে বললাম, এক দিন তুমি ভেবে দেখ, তোমার মাকে এ-কথা বলা ঠিক হবে কি না। ভেবে দেখ যে অন্ততঃ আমার পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা চুপি চুপি ঠেকিয়ে রাখা যায় কি না। আমি যদি স্টেট-স্কলারশিপ পাই, অনেক সমস্যাই সহজে মিটে যাবে হয়তো।

সমস্যা মিটে গেল সেদিনই।

হুরূরে, হুরূরে। খোশমেজাজে বলে উঠল সাত ফুট। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি দরাজ দিল। তার খুশি ভাবটা অত্যন্ত খাঁটি সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না।

দাদা কিন্তু খুব মনমরা হয়ে রইলেন। একটুও সাড়া দিলেন না হৈ-হল্লাতে। সাত ফুট বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করল, দাদার কাঁধে হাত রেখে খুব মোলায়েম স্বরে বলল, আমি বুঝতে পারি নি আপনার কথাটা। যাই হোক, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারের খুঁটিনাটি আমি জানতে চাই না। থাকগে সে সব কথা।

একটু পরে দাদাই সুরু করলেন। বললেন,—আজ হঠাৎ পুরোনো কথা সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আমার মনে। বাকী কাহিনীটা না বললে নিজেও শান্তি

পাব না। আর আমার এই অল্পবয়সী ভায়াদেরও কৌতূহল মিটবে না। তার চেয়ে বরং বলেই ফেলি।

সেই রাতেও রোজকার মত রাজবাড়ির ঘোড়াগাড়ি আমার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছিল। হঠাৎ মাঝপথে সামনে বসা কোচম্যানের পাশ থেকে একজন, আর পিছনে দাঁড়ানো সহিসের পাশ থেকে আর একজন লোক নেমে গাড়ির বাক্সের মত চৌকো কামরাতে ঢুকল। ছোরা হাতে। গলা টিপে ধরল; মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে ফেলল। শ্মশানঘাটে নিয়ে এসে শুধোল,—প্রাণে বাঁচতে চাই, না মরতে চাই?

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে কথা সরল না। একবার রাণীর কথা ভাববার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার মিষ্টি মুখখানাকে এই শ্মশানে তারই বাবার ভাড়াটে গুণ্ডাদের সামনে মনেও আনতে সঙ্কোচ হল। বললাম—আমি মরতে চাই।

কালো আলোয়ানে মাথা-মুখ জড়ানো ঝুটা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা গুণ্ডাবেশী নায়েব বলল—না, তোমায় মরতে দেওয়া সহজ নয়। রাজকুমারীর উপর উল্টো ফল হতে পারে। অবশ্য থানা-পুলিসে আমরা ডরাই না।

তবে শোন ছোকরা। এই তোমার বিলেতে যাবার টিকিট। একেবারে এখান থেকে বোম্বাই; সেখান থেকে বিলেত। আর এই তোমার নামে টমাস কুকের ব্যাঙ্কে একাউণ্ট। চার বছরের খরচের টাকা জমা দেওয়া আছে। তোমার জন্য নতুন কেনা কাপড়, চলনসই বিলেতী পোশাক সব কিনে স্টেশনে লোক অপেক্ষা করছে। এই গাড়ি তোমায় ভোরবেলা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। এখনই আমার সামনে তোমার মার কাছে চিঠি লেখ যে, তুমি লটারীতে টাকা পেয়েছিলে বলে, হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলে বিলেত যাচ্ছ। তার সঙ্গে দেখা করতে আসছ না সেই ভয়ে—পাছে বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলেকে তিনি বিলেত যেতে না দেন। আর সাবধান, বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত দু খানা ছোরা তোমার পাশাপাশি চলেছে সে কথা ভুলো না যেন'।

তার পর থেকে আমি এখানে। দেশে ফিরি নি। যেখানে আমার রাণী আমার জন্য জন্মায় নি, সেখানে আর ফিরে কি হবে? ভায়ারা বৌদির কথা

জিজ্ঞেস করে। দেশী বা বিলেতী যে-কোন বৌদি হলেই ওদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক জুটত। কিন্তু যেখানে শুধু মনে মনে মন্ত্র পড়াই সার হল, সেখানে বৌদি আসবে কোথা থেকে ?

দাদা চুপ করলেন। ওদিক থেকে টেলিফোন কথা কয়ে উঠল। এদিক থেকেও অনেক প্রশ্ন হল—পুরোনো ব্ল্যাকমেলের (মিথ্যা ব্যাপার সাজিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের) দু-একটি ঘটনার কথা, ঘটনায় জড়িয়ে ফেলা শিকারদের রীতি-চরিত্রের কথা—এ-রকম আরও কিছু আলাপ। আজ রাতের ঘটনার আসামীর 'পাষ্ট' খুব 'ক্লিন' ; ওর চরিত্রে কোন দোষ নেই।

তার পর অফিসার খস খস করে তার খাতাতে কি সব লিখল। পাশের ঘরে গিয়ে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করল। তার পর হাসিমুখে ফিরে এসে দাদাকে বলল —অলরাইট মিস্টার গিউহারে, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, তুমি এ-রকম একটা ঘটনার জড়িয়ে পড়েছিলে, আর তোমায় থানায় বসিয়ে প্রশ্ন করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার সম্বন্ধে নালিশকে আমরা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে লিখে নিয়েছি। তুমি আর তোমার বন্ধুরা এখন যেতে পার। বিদায়, ভারতীয় বন্ধুরা, বিদায়।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় সাত ফুট আবার দাদার কাঁধে হাত দিল। খুব সহানুভূতিমাখা গলায় বলল—তোমার, আশা করি, আজ ভাল ঘুম হবে। সুখস্বপ্ন দেখো। তোমার আর তোমার প্রিন্সেসের সৌভাগ্য কামনা করি।

বসন্তের মাতাল-করা রাত। নির্জনতা ভরে উঠেছে অদেখা রাণীর প্রতি অসীম মমতায়। তবু অল্প বয়সের কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। বললাম—দাদা, আমাদের বৌদি যেমন ভুয়ো, রাণীও তেমন নয় তো ?

থেমে পড়লেন দাদা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—ভুয়ো না সাচ্চা, তাতে তোমাদের কি ? তার সঙ্গে প্রেমের কথাটা যে সাচ্চা বৌদির কাজ করেছে, সেটুকুই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

এই ধরণীরে

সুপার-ফরট্রেস বোমারু বিমানটা হঠাৎ যেন দু ভাগ হয়ে খুলে গেল।

মহাশূন্যের বুক চিরে আমাদের এরোপ্লেন এগিয়ে চলেছিল। একেবারে ধূমকেতুর মত। হ্যাঁ, ধূমকেতুর মত। এইমাত্র আমরা একটা বর্মী গ্রামে শুধু আগুনের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু রেখে আসি নি।

জাপানী সৈন্যদের একটা আগুয়ান ঘাঁটির খোঁজ আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের হাওয়াই দল ওদের লুকোনো ঘাঁটির সুলুক সন্ধান নিয়ে বেড়ায়। তাদের কাছ থেকে রেডিওতে খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের এয়ার-ফিল্ডের কণ্ট্রোল-রুমে সাড়া পড়ে গেল। পড়ে গেল দৌড়ানোর পালা। সাজ সাজ রব নয়। সেজে আমরা ছিলামই। আর কেউ মরবার জন্য, মারবার জন্য এমন-ভাবে রাত-দিন তৈরী থাকে না। তার উপর আমি মোটে কাল ফার্লো ছুটি থেকে ফিরে এসেছি। বোমারু স্কোয়াড্রনের লোক আমি। শত্রুর ঘাঁটি তাক করে আকাশ থেকে বোমা ঝরাতে তর সয় না।

তাই বাড়ি থেকে লড়াইয়ে ফিরে আসতেও তর সয় নি। এই বর্মা-আসাম সীমান্তের যে সবুজ নরক "গ্রীণ হেল" তাতেই চলে এলাম। সন্ধ্যাবেলা তাঁবুর তলায় ব্ল্যাক আউটের মধ্যে এয়ার ফোর্সের জঙ্গীরা ঠাট্টা করল—ফ্রম ব্লু হেভেন টু গ্রীণ হেল—নিজের কুটীরের নীল স্বর্গ থেকে গহন জঙ্গলের সবুজ নরকে।

ঠিক তাই। নরক কাকে বলে দুশমনকে তা এইমাত্র দেখিয়ে এসেছি। উল্কার মত নীচে প্লেন নামিয়ে এনে আমরা মোটে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে এসেছি। স্কুলের গুলি খেলার মত তাক করে করে বোমা ফেলেছি জাপানী ছাউনির উপরে। ওদের মরণ চীৎকারের সঙ্গে মিশে গেছে আগুনের হল্কায় ওদেরই গোলা-বারুদ ফেটে ফেটে যাওয়ার আওয়াজ। সে কি তাণ্ডব! সে কি প্রলয়কাণ্ড! সবুজ নরকের আগুন-রাঙা নেশায় বার বার ফিরে এসেছি সেখানে। ছুঁচের মুখের মত সরু আর নিশ্চিত নিশানা করে আবার মেশিনগান চালিয়েছি। আবার। আবার। সবুজ নরকের মধ্যে রাঙা আগুন।

আসামে বলে হাতী নাকি যৌবন-তাড়নায় "মস্ত্" হয়। তখন নাকি পাগলের মত হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে। তছনছ করে। কিন্তু বেচারী হাতী। আমাদের বিজ্ঞানের কাছে কোথায় লাগে একটা অবলা হাতী। নিজের মনেই হাসি পেল। খুব তাচ্ছিল্য করে নীচে মাটির দিকে তাকালাম।

ধুঃর তোর ধরণী।

শুধু একটা অনাসক্ত অবহেলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না ওই মাটির পৃথিবীকে। তিনশো মাইল বেগে চলেছি। বাতাসকে কলা দেখিয়ে চলেছি আজ। শব্দের চেয়েও জোরে যাব শিগ্গিরি। অথচ প্লেনে বসে মনে হচ্ছে যেন একটুও গতি নেই। নেই নড়ন-চড়ন। ওই যে নীচে সবুজ নরকে গুলজার আর তোলপাড় চলছে, তার একটুখানি ঢেউও কি ছুঁতে পেরেছে আমার প্লেনকে?

আমাদের পাইলটও ঠিক এই কথাই ভাবে। আর বলে যে, ওর দেশের আকাশের চেয়ে আমার দেশের আকাশে এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরও বেশী আসে। এখানে আকাশটা নিস্তরঙ্গ, বাতাস প্রায়ই নিথর। নীচে পৃথিবীর লোকগুলো ঝড়-বাদলা-মেঘ এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়। আমরা তার অনেক উপরে উঠে এসে মজা দেখি। ধুলো-মাটির ধরণী আর মেঘ-বিদ্যুৎ-ভরা আকাশের তোয়াক্কা রাখি না।

এই তো দেখছিলাম প্রকাণ্ড একটা হ্রদ। এটা এমন গোপন দুর্গম জায়গায় যে আমাদের ম্যাপে পর্যন্ত নেই। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে চিকচিকে জল মিলিয়ে গেল। এল পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া। নীচে গাছের আর ঘাসের সবুজ জাজিম; মাথায় পাথরের ইস্পাত-রঙা মুকুট। আর কয়েক মিনিট পরেই নামতে আরম্ভ করব। সন্ধ্যার আগেই জঙ্গলে লুকোনো বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে। বোঁ ও ও ও।

বোঁ-ওঃ—ওঃ। হঠাৎ কান যেন ছিঁড়ে গেল আওয়াজে। প্লেনটা দু টুকরো হয়ে গেছে। ককপিট ভরে গেল ধোঁয়াতে। যন্ত্রের মত আঙুল চালিয়ে চাবি টিপলাম। উপরের চাঁদোয়াটা নীচে ফেলে দিলাম। আরেকটা বোতাম টিপে নিজেকে ককপিট থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম। প্যারাসুটের রশি ধরে টানলাম। রেশমী ছাতার তলায় ঝুলতে ঝুলতে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে নেমে চলেছি।

পরিষ্কার, নাঙ্গা চূড়াগুলো বেয়নেটের ফলার মত নিষ্ঠুরভাবে আমার দিকে উঠে আসছে। একটা ফলা তো নিশ্চয়ই আমায় বিঁধে দেবে। একেবারে ফুঁড়েও দিতে পারে। না। তবু ভয় করি না। আমি এয়ার-ফোর্স লেফটেনাণ্ট রঞ্জন দত্ত। সবুজ নরকের রাঙা নেশায় আমি জ্বলছি।

২

বাঁ হাঁটুটা বোধ হয় ভেঙ্গে গেল। না, হাঁটু নয়, সম্ভবত গোড়ালি। হতভাগা পৃথিবী শোধ নিয়েছে। তাই মাঠে নয়, পথে নয়, পুকুরে নয়, পাথরে ঠুকে দিল। ঠিক আছে। আমিও ভাঙ্গি না। মাটিতে পড়ে শুয়ে শুয়ে আমার চারদিকের নিঃশব্দতার সঙ্গে পরিচয় করতে লাগলাম। প্লেনে ওঠার পর থেকে এই প্রথম নির্জন নিঃসঙ্গ নিঃশব্দতা।

আর কি কি আছে আমার সম্পত্তি? একটা রিভলবার, একটা ছুরি, আর কয়েকটা বুক-ম্যাচ। অর্থাৎ অ্যামেরিকান ধাঁচের দেশলাই কাঠির প্যাকেট। প্যারাস্যুট দিয়ে নামবার সময় যে সব যন্ত্রপাতির ব্যাগ সঙ্গে থাকে তা নিয়ে নামার সময় হয় নি। যাক গে।

কতটা উঁচু এই পাহাড়? কি জানি। বুঝছি না। তবে শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি। অর্থাৎ একলা একটা লোকের পক্ষে বেশী উঁচু। আবার একজন বোমারু পাইলটের পক্ষে বেশী নীচু। যাক্ গে।

শুধু একটা নিয়ম এখন মেনে চলতে হবে। নীচের দিকে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ। একটা দিয়ে গড়িয়ে নেমে নীচে যেখানে যাই, সেখানে আরেকটা পাহাড়ের গা গড়িয়ে এসে মিশে গেছে। সেখান থেকে আবার উপরে উঠব কি করে? আর উঠেই বা আবার কোথায় যাব? যেখানেই যাই পৃথিবী বন্ধ হয়ে গেছে আমার জন্য। কিন্তু জংলী জোঁকের রক্তচোষার শিকার মিলে গেছে। একটু পরে পরেই পা থেকে জোঁক ছাড়িয়ে নিতে হয়। বড় জ্বালা করে। মাটির সৃষ্টি কিনা।

পরের দিন।

তারও পরের দিন।

আরও কত পরের দিন এমন করে গেল হিসাব নেই। দিন যায় গড়িয়ে। আমিও।

দুই পাহাড়ের জোড়াতে ছুরি দিয়ে গর্ত করলে একটু জল মেলে কখনও কখনও। একদিন তো একটা ঝর্ণাই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভাল জল খেয়ে ক্ষিধে পেয়ে গেল। কি খাই? কি খাই? পরশু দিন একটা বুনো জানোয়ার পেয়েছিলাম। রিভলবারের গুলিতে মারলাম। পাহাড়ী কাঠ দিয়ে ঝলসিয়ে দু দিন ধরে খেলাম। তার খানিকটা এখনও পড়ে আছে। কিন্তু পচে গেছে। মাটি আর পাহাড় তো রেফ্রিজারেটার নয়।

মনে পড়ল সেই জাপানী সিপাইর গল্পটা। একবার হামলা দিয়েছিলাম একপাল পথ-হারিয়ে-যাওয়া জাপানীর উপর। ওরা যে অনেকদিন খেতে পায় নি, তা বুঝতে পেরেছিলাম; ওরা দল থেকে ছিটকে পড়েছিল সে খবর জানতাম। কিন্তু এরাই বেশী বেপরোয়া হয়। তাই ওদের ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফেলে দিলাম। ককপিঠ থেকে দেখলাম একজনের পিঠ থেকে খানিকটা মাংস আলগা হয়ে খসে গেল। বেচারা দৌড়াতে দৌড়াতে খপ করে সে মাংসের টুকরোটা নিজের মুখেই পুরে দিল। দিয়েই ফেলে দিয়ে থুথু ফেলতে লাগল। কিন্তু ওর মুখে বাইরে ফেলবার মত থুথুও বাকী ছিল না। এখন সেই জাপানী সিপাইর গল্পটা থেকে থেকে মনে আসছে। যেন আমার বোমারু বিমানের ককপিট থেকে বার বার নীচে পাগলের মত দৌড়ানো তার চেহারাটা দেখছি।

রোজ রাতে তার চেহারাটা আমার উপরের আকাশকে আঁধারে ঢেকে দেয়। আগুনে ঝলসিয়ে দেয় রোজ দিনে। সেই ঝলসানোর জ্বালা খাঁক করে দিচ্ছে আমার পেট, আমার হাঁটু। হাঁটুর কথা মনে পড়তেই একবার আকাশের দিকে তাকালাম। ওই আকাশ, তার বুকে পাখীর মত সাঁতার কেটে ভেসে বেড়াত আমার সুপার ফরট্রেস। মাটিতে তো নয়, যে খুঁড়িয়ে না-হয় গড়িয়ে চলাফেরা করতে হবে।

আরও কদিন ক-রাত গেল। কতগুলি তা জানি না। হিসাব রাখবার উপায় নেই। রেখেই বা কি হবে। আগে প্রায়ই পাটকাই বুম শৈলমালা ম্যাপে

দেখেছি আর মুচকি হাসি হেসেছি। জুম জুম করে আকাশ ফুড়ে উঠে যেতাম। বুম তো কোন্ ছার, "ওভার দি হাম্প", হিমালয়ের কুঁজের উপর দিয়ে এক ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছে যেতাম চীনে। পাটকাই বুমকে হিসাবের মধ্যেই আনি নি কখনও। আজ সুবিধা পেয়ে সেই বুমও আমার উপর শোধ তুলছে।

না, তবু আমি হার মানি না। তাই খোঁড়া হাটু নিয়েই আমি এগিয়ে চলেছি। কোথাও না কোথাও পৌঁছাবই।

হঠাৎ আজ সকালে মনে পড়ল উপনিষদে নাকি লেখা আছে, চরৈবেতি—এগিয়ে চল। সেই এগিয়ে চলারই চেষ্টা করছি।

পরের দিন হাসি পেল সে কথা মনে পড়ে। পেট আর পিঠ মিশে গেছে, হাত আর পা সমান অকেজো। সামনে একটা বড় নদী। আর আমি মনে করছিলাম উপনিষদের কথা। যেন বৈতরণীর তীরে পৌঁছেছি।

কিন্তু নদীটা পার হতে হবে। পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া চলে না। রিভলবার আর বাকী গুলিগুলোকেও শুকনো রাখতে হবে। না হলে একেবারে না খেয়ে মরতে হবে। ইউনিফর্মটাও রেখে যাওয়া চলবে না। যদিও এটা বোধ হয় নাগা দেশ, এলাইড আর্মি আমায় দুশমন বলে ধরবে। নাগারা হয়তো মাথাটা নিয়ে ঘরের বারান্দা সাজাবে।

তাই সব কিছু সম্বল নিয়েই নদীতে নামলাম। বুট জোড়া বেঁধে তার ফিতে দুটো দাঁতে চেপে রেখেছি। কিন্তু নদীতে বড় স্রোত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত দুটো অবশ হয়ে গেল। পা দুটো আর চলে না। ইউনিফর্মটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেটা ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। পাথরের বোঝার মত টেনে আমায় জলের তলায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। গা এলিয়ে দিলাম স্রোতে। যাক, যেখানে খুশি নিয়ে যাক।

নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরটা আর বেশীক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না। গলা দিয়ে অনেকটা জল পেটে চলে গেল। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে যেই মুখ হাঁ করলাম, বুট জোড়া নদীতে তলিয়ে গেল। চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখি ওপারের কাছে এসে পড়েছি। পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সারি সারি নাগা। হাতে বর্শা পিঠে তীর-ধনুক। 'হেড হাণ্টার'

হবে নিশ্চয়ই। একবার এমন মাথাকাটুনে নাগা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের ঘরের চাল থেকে ঝুলছিল সারি সারি শুকনো কলা। কলা নয়, মানুষের কাটা হাত। শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়ে কালো কলার মত দেখাচ্ছিল। এখন চোখে আর কিছু দেখতে পেলাম না। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কানে আর এল না সর্ সর্ সর্ করে ঘা মেরে মেরে এগিয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ।

৩

সেই স্রোতের ধাক্কায় আমার স্মৃতি পাঁচ দিন পিছনে ফিরে এল।

বৃহস্পতিবার আর্মি মেসে ব্যাণ্ড নাইট। আমি এয়ার-ফোর্স লেফটেনাণ্ট রঞ্জন দত্ত গ্রীণ হেল থেকে ফার্লো নিয়ে এসেছি। মাত্র ক'দিনের জন্য। আমার কাছে ওরা অনেক মজার মজার গল্প শুনবে। শুনবে সবচেয়ে হালের চটকদার ঝগড় আর দুশমনের কেচ্ছা। ওই জাপানী সিপাইর নিজের কাঁধের মাংস নিজের মুখে পুরে দেওয়ার গল্পটার মত গল্প নাকি আর দ্বিতীয় হয় নি। 'ব্ল্যাক লেডি' ককটেল মদ আর্মির সবচেয়ে নতুন আবিষ্কার। সেটির দিব্যি দিয়ে বললাম যে, এই গল্পটা বানানো নয়, সত্যি।

তাই বেচারী মনোর নিজের হাতে তৈরী রান্না আমার ছুটির শেষ রাতে খাওয়া সম্ভব হবে না। ওর চোখ ছল ছল দেখে বিরক্ত হলাম বৃহস্পতিবারে। সেই সাবেকী প্যানপেনে বাঙ্গালী মেয়ে। এতদিন এয়ার-ফোর্স অফিসার্স ফ্যামিলি ব্যারাকে থেকেও শুধরাতে পারল না। হাতের লোহাকে সোনার পাতে মুড়েছে—পাছে 'ফেলো' অর্থাৎ সহকর্মী ইংরেজ অফিসাররা ঠাট্টা করে। পাছে বলে যে, ওটা পতিদেবতার দেওয়া হাতকড়া। মনোর সিঁথির সিঁদুরের ছোঁয়াটা যাই যাই করেও মিলিয়ে গেল না। সেদিন একজন সদ্য বিলেত থেকে আমদানি ওয়াক-আই মেয়ে অফিসার ওকে জিজ্ঞেসই করে বসল যে, এদেশে পুরুষরা বিয়ের পরে ঠোঁটের বদলে সিঁথিতে চুমু খায় কিনা।

মনো নিজের হাতে ব্যারাকের বারান্দায় তোলা উনুনে রেঁধেছিল। হোক

তা মাছের ঝোল, হোক মিষ্টি অম্বল, মনো বোঝে না যে আমার পৃথিবী আর মাটিতে নেই। আকাশে আমি উড়ে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, মনোর সঙ্গে এতদিন পরে ক'দিনের দেখা। আজ শেষ সন্ধ্যাটা এক সঙ্গে থাকলে আনন্দ হত বৈকি। কিন্তু আমি মেসে বুক ফুলিয়ে ইউনিফর্মের উপরে বোনা পাখীর পাখা জোড়া দেখাব। টেক্কা মেরে বুঝিয়ে দেব আমি রঞ্জন দত্ত—ওদের চেয়ে কত উপরে উড়ি। শুধু চলি-ফিরি না, একেবারে ভাসি আর উড়ি। তোমরা যখন মাটির বুকে পিঁপড়ের মত গুটি গুটি হেঁটে এগিয়ে চল, আমি ততক্ষণ বাজপাখীর চেয়ে জোরে বাতাস চিরে উড়ে যাই। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মত দুশমনকে লণ্ডভণ্ড করে দিই। মনো, বেচারী বাঙ্গালী মেয়ে। স্বামীর গৌরব, তার ওড়বার ক্ষমতা, দৃষ্টির বিশালতা এ সবের মহিমা পুরোপুরি ঠিকমত বোঝে না।

মনে মনে বিশেষ করে সেই কথাটাই ঘুরছিল। আজকের ব্যাণ্ড নাইটে তাই খুব জাঁকিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। ব্রিগেডিয়ার তখনও এসে পৌঁছান নি। সাব অল্টার্নরা সব চেয়ে খুদে-পুঁটি অফিসার। ওরা সাড়ে-সাতটাতেই এসে জড়ো হয়েছিল। বড় কর্তাদের সামনে ওরা থরহরি কম্পমান হয়ে যাবে। তার আগে তাই তামাক আর মদ দিয়ে ওরা নিজেদের গরম করে তুলছে। আস্তে আস্তে মৌতাত জমে উঠল। জমে উঠল একটার পরে একটা আরও বেশী রগড়-ভরা ধাপ্পা।

চাটনির মত চুটকি ঠাট্টা পরিবেশন হতে লাগল জিন আর হুইস্কির ফাঁকে ফাঁকে। মনোর মুখখানার কথা ভেবে এমন মন খারাপ করা অন্ততঃ আমার সাজে না।

চতুর্থবার যখন জিন ঢালা হয়েছে, বাজনা তখন বেশ জমে উঠেছে। ব্যাণ্ড মাস্টার নিজেও এক গ্লাস পার্ট একটু আড়ালে আবডালে সাবড়ে এসেছে। কাজেই সবটাই দারুণ জম-জমাট। একজন বিদেশী মাঝবয়সী কর্নেল ভাবের আবেগে আমায় জড়িয়ে ধরে যা বলল, বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় চমৎকার। সে বলল,—তুমি তো বাওয়া আমাদের রামধনুতে চড়ে বেড়ানো পিটার প্যান। একটি বার দেখিয়ে দাও না তোমার বিনা তারে আকাশে ওড়ার নমুনাটা।

বুকটা আরও ফুলে উঠল বৈকি।

আরেকজন সবিনয়ে নিবেদন করল যে, যদি আমি তাকে হাওয়াই হামলার একটা নমুনা এখনই দেখিয়ে দিই, সে তাহলে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে দিতে সোফার আড়াল থেকেই দেখবে।

হাসি আর আনন্দের চোটে নিজেকে সামলানো দায় হয়ে উঠল। আমি তো আর ওদের মত চুর হয়ে যাই নি। যদিও আমারি সবচেয়ে বেশী মাতাল হবার অধিকার হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার নিজে হাতে আমায়—এয়ার ফোর্সের এই জুনিয়ার বাচ্ছা বীর আমায়—খাতির করে পথ দেখিয়ে নিয়ে খাবার টেবিলে তার পাশে বসালেন। বিমান বীর যে পরের দিন ভোরেই আবার 'গ্রীণ হেলে' ফিরে যাচ্ছে জাপানীদের 'হেল' দেবার জন্য।

আমার মাথাটা আরও উপরে উঠে গেল। সামনে ক্লিয়ার সুপের প্লেট; তার মধ্যের ছায়াতে দেখতে পাচ্ছি উর্ধ্ব গগনে এয়ার-ফোর্সের রঞ্জন দত্তকে। পরম হেলায় সে নীচের পৃথিবীকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে গেলাম।

৪

দেখতে দেখতে ওই শ্যাম রঙের ক্লিয়ার সুপের মধ্যে বোঁ বোঁ করে নেমে আসতে লাগলাম। জোরে জোরে সুপের মধ্যে ঢেউ উঠতে লাগল। আশ্চর্য, রঞ্জন, এয়ার-ফোর্সের রঞ্জন দত্ত আমি, সেই সুপের শ্যামল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবে যেতে লাগলাম। সুপ যে এত অতল এত অপার হতে পারে, তা কে জানত।

তার চেয়ে মাছের ঝোল অনেক ভাল। সব কিছুই তার চেয়ে ভাল। মিষ্টি অম্বলও অনেক ভাল। উপরে আকাশের দিকে তাকালাম, প্রাণপণে তাকালাম। সেখানে নেই আমার সুপার-ফরট্রেস বোমারু বিমান। নেই খোলা আকাশের নীলিমা। রয়েছে শুধু রংহীন, ভরসাহীন, সীমাহীন শূন্য।

তার চেয়ে মাটি ভাল। মাটি, শ্যামলা কাদা মাটি। যা দিয়ে বানাব ঘর, যাতে বাঁধব বাসা, আবার সুরু করব প্রতিদিন আর প্রতি রাতের কাঁদা-হাসা। মাটি, ধুলো-মাটি, কাদা মাটি। কই মাটি?

কঠিন হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি খানিকটা মাটি। আর ছাড়ব না। নিশ্চয়ই মাটি। অমনি নরম পরশ, স্নিগ্ধ আবেশ। মাটি, মাটি। না হয় মাথা কাটনেওয়ালা নাগারাই ধরে নিয়ে যাক। তবু তো পা থাকবে যেখানে সেটা মাটি। আঃ, সে কথা ভাবতেও আরাম।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা; চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়। তাকিয়েও বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আঁধার ঘরে শুধু একটু নীল আলো। এক পাশে রয়েছে কারা? ডাক্তার? নার্স?

আর অন্য পাশে কার হাতটা অমন করে চেপে ধরে আছি? মনো? মনোর হাত। মাটির মত নরম, স্নিগ্ধ। সবুজ নরক থেকে ফিরে এসেছি। মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছি আমার 'ব্লু হেভেনে'। নীল স্বর্গ নয়, নীল সংসার।

ফলি বারজেয়ার

শুধু চরিত্র নয়।

পকেট নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে।

কেউ এই জাদুতে ভরা প্যারিসে বিশ্বাস করবে না যে ভারতীয় ছাত্রের পকেট গড়ের মাঠ। এই মেয়েটা থেকে আরম্ভ করে 'পেন্সনের' (প্যাঁসিয়ো অর্থাৎ সস্তা গোছের বোর্ডিং হাউস) বুড়ী মায় পাড়া-পড়শীরা সকলেই হাঁকাহাঁকি করবে—নিকালো রূপেয়া, আউর ভি নিকালো।

আমাদের দেশের গুণ্ডারা বোধ হয় বেকায়দায় পেলে এমন করেই ছোরা হাতে টাকা আদায় করে থাকে। নির্জন পথে ঘাটে একলাটি পেলে গলার স্বরটা চড়াতেও কসুর করে না। এই ফরাসী মুল্লুকেও 'য়্যাপাসে' অর্থাৎ গুণ্ডার গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু এখানে বোধ হয় গুণ্ডামির দরকার হবে না। বাড়িউলিই মিঠে-কড়া শুনিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করবার ভয় দেখাবে। চোখ পালটে বলবে—আর কেলেঙ্কারি করে কি করবে, বাছাধন। ফেলে দাও হাজার বিশেক ফ্রাঙ্ক। তোমাদের তো টাকার অভাব নেই। তোমরা হচ্ছ মহারাজের জাত।

কিন্তু এত সব কথা গুছিয়ে ভাববার সময় নেই। বলিই বা কি করে ছাই। রামুর একেবারে গা জড়িয়ে, একরকম লেপ্টে জড়িয়ে, তালে তালে পা ফেলে হাঁটছে যে মেয়েটা। একটু আলাদা ডেকে নিয়ে অন্ততঃ ঠারে ঠোরে যে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব তারও সুবিধে নেই। বরং ভয় আছে যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটা আমাকেই না জাপটে ধরে।

শীতের নিশুতি রাত। প্যারিসের ভর নির্জন রাস্তা। ঠাণ্ডায় পথে ঘাটে একটা বেওয়ারিশ কুকুর পর্যন্ত নেই। আর গরীব ভিখিরীরাও তো এদেশে এ হেন হাড়কাঁপানি শীতে থেকে থেকে তুষার ঝরানো রাতে বেঞ্চিতে বা ফুটপাতের উপর শালগ্রাম শিলা মেরে থাকবে না। সম্ভব নয়।

আমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। মানে, এই অচেনা বিদেশে বিভুঁয়ে মাঝ-

রাতে পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু এটাকেও য়্যাড্‌ভেঞ্চারের সামিল বলে ধরে নিয়েছিলাম। আপনি হয়তো বলবেন গরীবের ঘোড়া রোগ। কিন্তু আমি বলব এ আমাদের একেবারে নিখাদ নির্ভেজাল য়্যাড্‌ভেঞ্চার। ভেবে দেখুন, সেই উত্তর মেরুতে যাওয়া বা এভারেস্টের চুড়োয় ওঠার চেয়ে আমার পক্ষে প্যারিসের ফলি বারজেয়ারে নাচ দেখতে আসাটা কম দুঃসাহসের ব্যাপার হল কিসে ?

দুই বন্ধুতে গিয়েছিলাম কন্টিনেণ্টে বেড়াতে। কন্টিনেণ্টে মানে স্পেনে। ওখানে নানারকম গোলমাল বিদ্রোহ চলছে বলে বাইরে থেকে কেউ আজকাল বেড়াতে যাচ্ছে না। টাকা বদলি এক্সচেঞ্জে স্পেনের টাকা পেসেতার দাম দাঁড়িয়েছে জলের দরের মত। কেবল বাপ-পিতামোর বংশধর হয়ে পৈত্রিক প্রাণটা সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছাটা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তা হলেই সবচেয়ে কম খরচায় ওদেশে এখন বেড়ানো চলে। লণ্ডনে কলেজে সবাই বসন্তকালের ছুটির পর এসে নাক উঁচু করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রটনা করেছে কে কোন্ জার্মাণী ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড পাড়ি দিয়ে এসেছে। খেয়েছে কোন্ হোটেলে, নেচেছে কোন্ নাইট ক্লাবে, এমনকি কপাল ঠুকে 'রুলে' ফেলেছে কোন্ জুয়োর আড্ডায়।

সব সহ্য হয়েছিল। কিন্তু সইল না প্রাণে যখন ব্যাণ্ডো অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে নতুন ময়ূরকণ্ঠী রঙের সোলারো কাপড়ের স্যুট পরে গলায় টাইয়ের বদলে ফরাসী ফিনফিনে রেশমী স্কার্ফ জড়িয়ে, শুনিয়ে গেল তার দিগবিজয়ের কাহিনী। শেষ পর্যন্ত একজন স্পেনিশ কণ্টেসা অর্থাৎ কাউণ্টের ঘরণী নাকি তার প্রেমে মশগুল হয়ে এমনি তাকে ধাওয়া করেছিল যে সে সাতদিনের বেশী মন্টিকার্লোতে টিকতে পারল না। একদিন মাঝ-রাতে ক্যাসিনো অর্থাৎ জুয়ার ক্লাব থেকে গা ঢাকা দিয়ে সোজা পিটটান দিয়ে তবে তাকে কণ্টেসার হাত এড়াতে হয়েছিল। কালার পিরীতি আর কারে কয় ?

ব্যাণ্ডো তো মহা বন্ধুর কাজ করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। য়্যা, বলে কি ? শেষ পর্যন্ত একজন কণ্টেসা ? এ হেন সোনা দিয়ে বাঁধানো কপাল ? আচ্ছা, আমাদের পোড়া নসীবে তাহলে

তার চেয়েও বড় কিছু জুটে যেতে পারে। একবার তাল ঠুকে লেগে দেখা যাক না।

হ্যাঁ, রামুকে বললাম সে কথা। ও আর আমি দুজনেই পাল্লা দিয়ে কম খরচার সাধনা করি। আমার গুণে-গেথে স্কলারশিপের মাসোহারাটুকুর মধ্যে চালাতে হয়। রামুর অবস্থা তার চেয়ে একরত্তিও সুবিধের নয়। যদিও বাড়ি থেকে টাকা আসে। কাজেই রিভিয়েরা আর পরলোকের সেই নন্দন-কানন দুটোই আমাদের নাগালের বাইরে। সমানভাবেই একেবারে। বরং হঠাৎ বিনা নোটিশে এই পোড়া পৃথিবীর পাট গুটিয়ে নিলে হয়তো বা আগের জন্মগুলোর জমাখরচের হিসাবে কোনগতিকে স্বর্গালোকে পেঁৗছোলেও পেঁৗছোতে পারি। কিন্তু রিভিয়েরা?

দিল্লীর লালকেল্লায় শুনেছি সাজাহান বাদশা দেওয়ানী খাসে লিখিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তা এখানেই। সাজাহান হয়ে জন্মাইনি বটে, কিন্তু নয়া দুনিয়ার স্বর্গ রিভিয়েরায় কি আর কোনদিন যেতে পারব না?

রিভিয়েরার সোনালী বালুচরে চরে বেড়াতে হলে যা রেস্ত দরকার তা কিছুতেই হিসাব করে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত রামু চেঁচিয়ে উঠল,—রেখে দাও তোমার ব্যাঙের গুলগাপ্পি। কণ্টেসা, না কচু। কাঠ-কুড়ুনী হবে বোধ হয়।

আমিও ততক্ষণে প্রায় সেই সিদ্ধান্তই করে ফেলেছি। তবু হিসাব খতিয়ে দেখা গেল যে, এই ক'মাসে অসময়ে দরকারে-অদরকারে লাগবে বলে চেষ্টাচরিত্র করে যা টাকা জমিয়েছিলাম তা দিয়ে স্পেনটা ঘুরে আসা যায়।

তা বিবেচনা করে দেখুন—মানুষের আশার শেষ নেই। কাটাচিপি করে স্পেন দেশটা যখন ঘুরে বেড়ালামই, প্যারিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর প্যারিসটা দেখে যাব না? লোকে তাহলে বলবে কি? আর নিজেরাই যে নিজেদের বেকুব বলে মনে করতে থাকব রাতদিন। সে অনুতাপ, সে আফসোসের সীমা থাকবে না।

অতএব প্যারিসের একটা স্টেশন থেকে নেমে শহরের মধ্যে দিয়ে অন্য স্টেশনে

লণ্ডনের ট্রেন ধরতে যাবার সময় আর একবার হিসাব কষতে বসলাম। শেয়ালদা থেকে হাওড়া যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই একটা জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে।

আপনার পকেটে তো আর আমাদের মত আরসোল্লা ডন মারে না। কাজেই আপনি বুঝবেন না আমার আর রামুর অবস্থা। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে খুব সস্তা পেন্সনে যদি শুধু রাতে ঘুমানোর ঘর নেওয়া যায়, আর বাইরে বাইরে সস্তা রেস্তোরাঁ থেকে খাওযা যায়,তাহলে হাতে যা টাকা বাকী আছে তা দিযে এ যাত্রা প্যারিসটাও সেরে নেওযা যায।

আমেরিকানরা বলে ডুইং ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ইণ্ডিযা সারছি। আমরা তাব চেযে ভালভাবেই প্যারিস সারব। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাব প্রতীক, তাব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমরা—এ হেন কত ভারী ভারী কথা মনে এসে গেল। কি কি দেখব তার তালিকা সে অনুসারেই তৈরী কবে নিলাম। সরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে লুভর্ মিউজিয়াম পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত আমি বলে ফেললাম—কিন্তু ম্যাক্সিম? ম্যাক্সিম অব প্যাবিস? সেখানে একবেলা না খেলে কি আব প্যারিস দেখা সম্পূর্ণ হতে পারে?

নোটবুক থেকে মুখ তুলে হাতের বুড়ো আঙুলটা থুতনিতে বাখল বামু। বলল,—দি আইডিয়া! প্যারিসে যখন এসেছি তখন ম্যাক্সিম অবশ্যই। তা যত খরচাই লাগে। তবে তার সঙ্গে যোগ দাও ফলি বারজেযার।

খুশিতে উছলে উঠে দুজনেই জুতোর গোড়ালিতে ভর দিযে এক পাক ঘুরে নিলাম। যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

কিন্তু ড্রেস-স্যুট অর্থাৎ রাত্রে খাওযার পোশাক নেই বলে ডিনারের হাঙ্গামে গেলাম না। দুপুরের লাঞ্চ সারলাম সেখানে। আর ফলি বারজেয়ার থেকে মাঝ রাতে সবাই যখন হুস হুস করে নিজের মোটরে, না হয ট্যাক্সিতে ফিরে যেতে লাগল, আমাদের দুই হিন্দুর তখন সম্বল রইল চরণ মাঝি।

তা, তাতে আর লোকসান কি, বলুন? আর্ট ইজ দি থিং। জীবনে শিল্পই হচ্ছে আসল, সুন্দরই হচ্ছে সত্য। তার আরাধনা, তার আস্বাদ—সেটাই বড় কথা। সে পরম সম্পদ কি আর মোটর চড়লেই বেশী পাওয়া যায়? না, পাযে

চলে চলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে সে ধনেও টান পড়ে? আমরা আকাশে পা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

আমি বললাম,—যা বল্লিস্ ভাই রামু, এই আমার বেশ লাগছে। শীতে হাত-পায়ের আঙুলগুলো অবশ্য কনকন করছে। ওভার কোটের কলার উল্টে তুলে দিয়ে কানদুটোকে কোনমতে ঢাকবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তবু শিল্প সাধনার যা অপরূপ প্রতিভা দেখলাম তাই মনকে উত্তাপে ভরিয়ে রেখেছে—তাই না?

রামুও উৎসাহে সায় দিল,—ঠিক বলেছিস। ওই মোটরবিহারীরা এখ্খুনি বাড়ি ফিরে নাক ডাকাতে সুরু করবে। না হয় ককটেলের ঝোঁকে আবোল-তাবোল ভাবতে থাকবে। কিন্তু এই যে আমরা নিখুঁতভাবে সাদা চোখে সাদা মন নিয়ে এই নাচের দৃশ্যগুলো হরেক রকম শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করতে করতে চলেছি—এটা কি আর ওরা পাবে? ওরা কি হারিয়েছে তা ওরা জানে না।

রেখে দাও তোমার ওদের কথা। এমন সব ভালৃগার দর্শক, দেখলি না, যখন ওই নগ্ন নৃত্যটি দেখছিল, কত লোক একশো ফ্রাঙ্ক দিয়ে অপেরা গ্লাস ভাড়া করে সে নাচটি দেখতে লাগল। ছ্যাঃ, কি রুচি সব!

রামুও সায় দিল, বলল—ঠিক বলেছিস, আমরা কেমন দূর থেকে সাদা চোখে স্বাভাবিক মন নিয়ে ভগবানের সৃষ্টি সৌন্দর্য সোজাসুজি দেখবার, অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। আর ওরা? ছ্যাঃ। কতখানি বসন আছে, তার কতটুকুই বা আছে শাসনে, সে সব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কি আর 'এসথেটিকসের' দিকে নজর থাকে? না সুন্দরের অনুভব করা চলে?

দুজনেই বেশ একটু ধাপে ধাপে নৈতিক স্তরে উপরে উঠে গেলাম। মনটা চড়া সুরে বাঁধা রইল। হায় ব্যাঙো, তুমি থাক তোমার কণ্টেসার কাহিনী নিয়ে। আমরা এই নিশুতি রাতের নিঃসম্বল সাধনায় রূপের মধ্যে অপরূপের সন্ধান পেয়েছি।

এমন সময় কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রামুর উপর? আঁতকে উঠলাম। পুলিস নয় তো? শীতের প্যারিসে রাতদুপুরে লক্কা পায়রারা হেঁটে বেড়ায় না। পকেট-মাররা খোলাখুলি বুক ফুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করে না। তবে? গুণ্ডা

নয় তো ? তাহলে তো এক লহমাতেই হেস্তনেস্ত করে ফেলত ? তবে আমাদের পকেটে কি থাকবে তা তো চেহারা আর কাপড়-চোপড়েই মালুম। সাহেব গুণ্ডারা কি এত কাঁচা হবে ?

কিন্তু এ যে মেয়েলী গলা, মেয়ের চেহারা। গায়ে ওভারকোট নেই। তা বোধ হয় খারাপ মেয়ে বলেই এই শীতের রাতেও নিজেকে ওভারকোটে ঢেকে রাখতে চায় না। কথা বলছে বড় মিঠে সুরে। মাথায় ভরে গিয়েছে সে সুর। সত্যি, ফরাসী ভাষাটাই কি মিঠে ! তার উপর তাতে যখন থাকে 'আমুরে'র ময়ান। ভেবে দেখুন, ফরাসী 'আমুর' কথাটার মধ্যে সংস্কৃত প্রেমের 'ব' ফলাটুকু নেই। নেহাতই কোমল, কমনীয়। মাখনের মত নরম অথচ মধুব মত মিঠে।

কিন্তু এই নির্জন শীতের রাতে ? কালিদাসের লাইনগুলো মনে পড়ল। "রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুবমার্গে" অভিসারিকারা আনাগোনা করতেন। কিন্তু বিদ্যুৎ তাদের পায়ের কাছে চমক দিয়ে দিয়ে পথ আলো করে তুলত। আহা, এই ফরাসিনীর মুখও আলো করে তুলেছে রাস্তার 'মার্কারি ভেপার' ল্যাম্পের নীলাভ আলো।

আঃ, রামুটা একেবারে লাকি ডগ্। পকেট ফুটো হলে কি হবে, কপাল মোটেই ফুটো নয। ওকে অভিনন্দন করে সরে পড়াই বোধ হয উচিত হবে। রসভঙ্গ হলে সেই দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হবার সময়কার ব্যাধের প্রতি অভিশাপ আমায লাগতে পারে। বাবাঃ, আমি কারও অভিশাপ কুড়োতে চাই না।

কিন্তু রামুই আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। ফিস্ ফিস্ করে কাছে আসতে বলল। জানিয়ে দিল যে মহা বিপদ হয়েছে।

বিপদ কেন ? ব্যাণ্ডো যে কণ্টেসার কাহিনী ঝেড়েছিল একখানা ! আর এ যে খাস প্যারিসের জলজ্যান্ত একজন অভিসারিকা। বিপদের কি হল ? না হয় ঝেড়ে ফেলে সটান বাড়ি ফিরেই চল। তা বিপদ কিসের ?

কাতরকণ্ঠে রামু জানাল—ভাই মহা বিপদ। বলে কিনা সঙ্গে নিয়ে চল।

কথাটাতে একটা ধাক্কা খেলাম। এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি যে ঘরে নিয়ে

যাওয়ার কথা উঠতে পারে। সাদা চোখে মন না রাঙায়ে কলি বাঙ্গিজেয়ারের নগ্ন নৃত্যও দেখে এসেছি। শিল্পে রঙ্গিন চশমা দিয়ে দেখে এসেছি রূপের পসরা, যৌবনের অভিষেক। ভেবে এসেছি যে ও-ই হচ্ছে আমার মানস স্বপ্নের অরূপরতন। রূপসায়রের পারে দাঁড়িয়ে রূপসীর বালুচরের কথা মনেই হয় নি।

কিন্তু দুনিয়াটা অত বোকা, অত নিরামিষ যে নয় তারই হাতে হাতে প্রমাণ লেপটে আছে রামুর গায়ে। জড়িয়ে ধরেছে তার গলা। চাইছে তার সঙ্গে ঘরে গিয়ে উঠতে। শিল্পের এই রকম ব্যভিচার? নেভার, নেভার।

হেঁকে উঠলাম প্রায়—আবার বেশী চেঁচাতেও সাহস নেই, কি জানি যদি গোটা কতক 'য়্যাপাসে' অর্থাৎ গুণ্ডা রাস্তার আনাচ-কানাচ থেকে এসে হাজির হয়? যদি ব্ল্যাক মেল করতে চায়? বলে, আমাদের মেয়েকে ফুসলোচ্ছিলে। এখন নিকালো রুপেয়া; না-হয় কর থানা-পুলিস!

মাথা গরম হয়ে উঠল। রামুর কাছে এগিয়ে এসে বললাম,—কখ্খনো নয়, কখ্খনো নয়। বিদেয় কর ওটাকে এখুনি।

কাতরকণ্ঠে রামু বললে,—কিন্তু কম্‌লি যে নেহি ছোড়তা।

দ্বিগুণ জোর দিয়ে বললাম,—আলবাৎ, একশো বার ছোড়তা, বল যে পুলিস ডাকব।

রামু তাতে ভরসা পেল না। বলল—পুলিস কোথা রে বাবা? তার চেয়ে চুপে চাপে চল বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাই। সেখানে ওর মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

উঁহুঃ, অত কাঁচা মেয়ে নয় এরা। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। সবাইকে জাগিয়ে তুলে জানাবে যে, এতক্ষণ যে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে, তার জন্যেও টাকা দিতে হবে।

তাও তো বটে। এমন কি পুলিস ডেকে নালিশ করতে পারে যে চুক্তি অনুসারে টাকা দিই নি বলে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বনাশ! শুধু চরিত্র নয়, পকেট নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। হা ভগবান, এতও ছিল তোমার মনে।

এদিকে অন্য ভাষায় কথা কয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা খুব ভরসা পেয়ে গেছে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—যাক বাঁচালে আমায়। আমি অবশ্য বেশী টাকা চাইব না।

চটে গেলাম। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। সেই শীতের রাতেও। এগিয়ে এসে মুঠো শক্ত করে পাকিয়ে বললাম,—সরে পড়, কেটে পড়, মাদমোজেল, ওসব সুবিধে হবে না। আমরাই পুলিস ডাকব যদি চালাকি করতে চাও।

চোখ নিচু করে সে বলল—না, না, আমি কোন চালাকি করব না। বেশী টাকা আমি চাই না। শুধু····

হোয়াট? বেশী টাকা তো দূরের কথা, তোমাকে পুলিসে দেব আমরা।

হ্যাঁ, মনে মনে ভেবে দেখলাম যে, যুদ্ধের শাস্ত্রে বলে যে এগিয়ে এসে হামলা করাই নিজেকে বাঁচানোর সব চেয়ে বড় উপায়। আক্রমণই শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা। তেড়ে হাঁকলাম,—তোমায় পুলিসে দেব আমরা।

রাগের চোটে জাদার্ম´ (পুলিস) কথাটা ইংরিজী বানান অনুসারে উচ্চারণ করে ফেললাম গেন্ডার মেস। কিন্তু যা মেজাজ সে উচ্চারণে ফুটে বের হল, তাতে কথাটার মানে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভাল করে নজর পড়ল। তন্বী তনুলতার উপরে ফুলের মত কোমল মুখ। তার মধ্যে ফুটে রয়েছে বনহরিণীর ভীরু চাহনি। হ্যাঁ; স্বীকার করতেই হবে দেখতে ভাল, এমন কি খুবই ভাল। এত ভাল না হলেও চলত। কন্টেসাই হোক আর কাঠ-কুড়ুনীই হোক, তাতে রামুর কি বা আসে যায়।

না, এসব মায়া-রাক্ষসীর পাল্লায় পড়া ঠিক নয়। ও দেখতে ভাল বলেই বেশী বিপদ। যত দেরি তত বেশী বিপদ। রামুকে বাংলায় বললাম—দে না ঝটকা মেরে একটা ধাক্কা। শেষকালে কে এসে পড়বে ঠিক নেই।

রামুও যেন জেগে উঠল। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যাবে এমন সময় মেয়েটা করুণ সুরে আবার বলল,—আমার বেশী টাকার দরকার নেই। সামান্য হলেই চলবে। আমি সত্যি দেখতে ভাল, এই দেখুন, পেন্ট পর্যন্ত করে আসি নি।

হুঁ। ওতে হিঁদু ভোলে না। দরকার হলেই তোমরা সেজেগুজে নকল সুন্দরী সাজতে জানো। আরেকটু বয়স হলেই তা সুরু করবে। কিন্তু আমরা সে সব যাচাই করতে তো প্যারিসে আসি নি।

আমরা সত্যি হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল,—না, না মঁসিয়ে, টাকা তোমার যা খুশি তাই দিও। আমার কোন দাবি নেই।

তাতেও কোন ফল হবে না। মেয়েটা সত্যি বোকা। কারণ আমাদের এত বোকা ভাবে যে সস্তার লোভ দেখিয়ে একেবারে তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছে দিতে চায়। মনের উত্তেজনায় এবার মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে এল। কভি নেহি, নেহি, নেহি।

নেহি কথাটা বোধ হয় দুনিয়ার সব দেশেই বোঝা সহজ। যদি বা শক্ত হত, আমার গলার আওয়াজেই তার মানে মালুম করিয়ে দেবে।

কাতরভাবে অনুনয় করল মেয়েটা,—মঁসিয়ে, দয়া কর। এক ফ্রাঙ্কও চাই না। শুধু তোমার ঘরে রাতটা থাকতে দাও। বড় শীত। আমার গায়ে ওভারকোট পর্যন্ত নেই।

রাস্তার আলো ভীরু হরিণীর চোখের উপর এসে পড়ল আবার। দেহ-পসারিণীরা কি আর তাদের পসরা ঢেকে রেখে, লুকিয়ে রেখে ব্যবসা করতে বের হবে? কিন্তু এই রাক্ষুসী তার চেয়ে বেশী শয়তান। একবার যদি ঘরে পা দিতে পারে তাহলে কি আর আমাদের রক্ষা আছে? যদি ওকে শীতের জন্য ঘরে থাকতেই দিই, আর নিজেরা সিঁড়ির মোড়ে ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে রাত কাটাই, তাহলেও কি আর কোন বুদ্ধিমান আমাদের ধর্মপুত্তুর বলে বিশ্বাস করবে?

ওরে রামু, বোকচন্দর, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, যদি বাঁচতে চাস।

ম্যাক্সিমের বিল আর ফলি বারজেয়ারের টিকিট পকেটটাকে একেবারে শুষে নিয়েছিল। তবু সে খরচটা তো করব বলেই ঠিক করে নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করেও কিন্তু সামলাতে পারলাম না। প্যারিস থেকে ভুল ট্রেনে উঠে যে বন্দরে এসে হাজির হলাম, সেখান থেকে ইংলণ্ডে যেতে জাহাজের ভাড়া লাগবে বেশী। গেল; দুপুরের আর বিকেলের খাওয়ার পয়সাও উবে

গেল এই টিকিট কিনতে গিয়ে। তা যাক, সস্তায় স্পেনে কিস্তিমাৎ করেছি। ম্যাক্সিমে খেলাম, দেখলাম ফলি বারজেঁয়ার। দেশে না হয় আপনার দেদার টাকা পাবে ; সখ আর সামর্থ্যের অন্ত নেই। কিন্তু দেখা আর চাখার ব্যাপারে এত কষ্ট করে এত রস পাওয়ার সৌভাগ্য কি আর আপনার হবে ?

কিন্তু এ বয়সে ছাই খিদেও আবার হয়ে উঠে রাক্ষুসে। কিছুতেই সামলাতে পারি না। পকেটে মোটে পাঁচ পেনী। ও তো লণ্ডনে পেঁাছে স্টেশন থেকে বোর্ডিং হাউসে যেতে বাস ভাড়াতেই লেগে যাবে। কাজেই ও পয়সায় হাত দেওয়া চলবে না।

অনেক মনোযোগ দিয়ে ঢেউ গুনতে লাগলাম। কটা 'সীগাল' পাখী একসঙ্গে দেখা যায় ? কটা ট্রলার আজ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে ? ইংলিশ চ্যানেলে বেশী ঝড় ওঠে, না বিস্কে উপসাগরে ? জাহাজের উপরে ক্যাপ্টেনের ডেকে উঠে তার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করলাম। শেষ পর্যন্ত জাহাজের বৈঠকখানায় রেডিও খুলে দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম।

ক্ষিদের যে এতগুলো দাঁত আছে তা আগে কখনও জানতাম না। আব এত বাঘের নখের মত দাঁত ! পেটে কামড় দিচ্ছে। মাথা করছে ঝিম ঝিম। সকালেও খাই নি। মতলব ছিল যে জাহাজে উঠবার আগে, সকালের আর দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে একটা লাঞ্চ খেয়ে এক ঢিলে দু' পাখী মারব। সে মতলবটা তো ফেঁসেই গেছে।

সন্ধ্যে নাগাদ গা বমি বমি করতে লাগল। আর পারি না। শেষ পর্যন্ত সবার নজরে পড়ে যাব। হাসবে লোকে, ডুববে দেশের নাম। তার চেয়ে না হয় লণ্ডনে পেঁাছে পাঁচ মাইল হাঁটব বাসায় পেঁাছবার জন্য। এখন তো খেয়ে নিই।

কিন্তু পাঁচ পেনী পকেটে নিয়ে জাহাজের রেস্তোরাঁয় ঢুকলে কি আর জাত থাকবে ? সেখানে শুধু এক টুকরো টোস্ট, মাখন মাখানো, তা তো আর চাওয়া যায় না। শুধু এক কাপ চা না হয় নিলাম। অমনি দিতে হবে তার পেছনে অন্ততঃ তিন পেনী টিপস্ বকশিশ। না, এক কাপ চাও চলবে না। তাহলে ?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম যে, ওতে এক টুকরো চকোলেট কেনা

চলে। তার পরে খাও বিনি পয়সায় এক চুমুক জল। ওইতে যতদূর হয়। পেটে পাথর চেপে পড়ে থেকেও যখন কুলোল না তখন এতেই যথালাভ।

লাউঞ্জে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চকোলেট চুষছি। খাচ্ছি না কিন্তু। তাহলে যে ফুরিয়ে যাবে চটপট।

রামুর মুখে একটু হাসি ফুটল। বলল,—যাই বল ভাই, কালকে ম্যাক্সিম আর আজ উপোস—জীবনে কত বড় একটা কণ্ট্রাস্ট (বৈষম্য) হল ভেবে ছাখ। কজনের কপালে আর তা জুটেছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—তার চেয়ে বড় কণ্ট্রাস্ট তো কাল রাতেই জুটেছে তোর কপালে। ফলি বারজেয়ার আর তার বাইরেই সেই রাস্তার মেয়েটা।

হঠাৎ আয়নায় নিজের মুখটা নজরে পড়ল। আজ যে খাই নি কিছু সারাদিন তার ছাপ সেখানে স্পষ্ট। কিন্তু এ অনশন তো শুধু একদিনের, সামান্য কতটুকু সময়ের। আর কালকের ওই মেয়েটা? ভাবতেই চমকে উঠলাম?

ওর তনু তো তন্বী নয়; অনাহারে, অর্ধাহারে ক্ষীণ। যে খেতে পায় না ভাল করে, সে মেয়ের মুখ অল্পবয়সে কোমল না হয়ে আর কি হবে? আর ক্লান্ত দুঃখী চাহনিকে বনহরিণীর ভীরু চাহনি বলেই তো কবিরা রসিকরা দূর থেকে ভুল বুঝবে। তুষারঝরা দুরন্ত রাতে যে মেয়ে শুধু পাতলা ফ্রক পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে তো শুধু পসরা সাজাবার মতলবে নয়।—সে মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, ওর থাকার জায়গা নেই। পেটে নেই ভাত।

আমাদেরও চাল-চুলো এমন কিছু ছিল না—তা বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই। তবু যে শুধু রাতের জন্য আশ্রয় চেয়েছিল, সেটাও হয় তো চাইত না—ওর ওভার-কোট থাকলে। ফলি বারজেয়ারের এয়ারকণ্ডিশন করা আরামে বিলাসে ভরপুর স্টেজে যে তনু নগ্ন নৃত্যে বিলসিত হয়ে উঠে, সে তনুকে অনশনে অর্ধাশনে সামান্য বসনে বরফের রাতে রাস্তায় ছেড়ে দিলে তার মধ্যে যে চাহনি ফুটে উঠবে, তাকে কোন্ অপরূপের রূপায়ণ বলে ধরে নিব?

না; গলা চকোলেটটা গলায় আটকে গেছে।

অপরা

হঠাৎ অজিতাকে নাচতে দেখে সুজিত চমকে উঠল।

এখানে? স্ল্যাক্‌স্‌ অর্থাৎ মেয়েদের প্যান্টালুন পরা থোড়াই-কেয়ার-করা সাজে? সিমলা পাহাড়ে মেরানি রেস্তোরাঁয় মিলিটারিদের ভিড়ে?

ভাল করে একবার চোখ কচলিয়ে নিল সুজিত। না, কোন সন্দেহই নেই। এ অজিতা না হয়ে যায় না। এ মূর্তি যে মনের মধ্যে আঁকা আছে। অজিতার অরুণ-বরনী স্মৃতি বেদনায় নীল হয়ে আছে। কিন্তু···কিন্তু···

কিন্তু, কিন্তুর উত্তর তো আর শুধু আন্দাজে মেলে না। এগিয়ে যাবে নাকি সুজিত ওর কাছে? ওর টেবিলে গিয়ে যদি হাজির হয় তাহলে কেমন হয়? সম্ভবত সে টেবিলে অন্য যারা বসেছে তাদের সঙ্গেই অজিতা এখানে নাচতে এসেছে। তাদেরই নিমন্ত্রণে। সেখানে বিনা পরিচয়ে বা বিনা অনুমতিতে তো আর সে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে পারে না।

যেন এমনি অকারণে চারদিকে সে নজর ছড়িয়ে দিতে লাগল। এক দৃষ্টে কোন বিশেষ দিকে তাকানো যে একেবারে অসভ্যতা। কোন দিকে কৌতূহল দেখানো বা মনোযোগ দেওয়া এ রকম প্রকাশ্য জায়গায় বিলাতী শাস্ত্রমতে একেবারে অচল। তা ছাড়া অন্য লোকে তাকে বাঙ্গাল ভাবতে পারে। কাঙ্গাল তো ভাববেই। তার পরনে ফিটফাট পোশাক; কাঁধে জ্বল জ্বল করে শোভা পাচ্ছে একটা রাজমুকুট। মেজর সুজিত এখন সংসারে সবার মাঝখানে বুক ফুলিয়ে চলে। সে এখন চেষ্টা করলেও নৃত্যপরা কোন মহিলার দিকে হ্যাংলাভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে না।

যার সঙ্গে অজিতা নাচছে সেও একজন মিলিটারি অফিসার। আচ্ছা, এর সঙ্গে অজিতার কতটা পরিচয় আছে? ভাব বা মাখামাখি কতখানি? পাইপটা মুখে দিয়ে যেন আনমনেই সুজিতা চারদিকে তাকাতে লাগল। অবশ্য কাউকেই সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে না।

চা খাবার সময়েও নাচা চাই। যুদ্ধের বাজারে সিমলা একেবারে সরগরম।

এযাত্রা ইংরেজরা আবার টিকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। রাশিয়া থেকে জার্মাণরা হঠে আসছে। বর্মায় মিত্রপক্ষ দিচ্ছে পাল্টা হানা। মিলিটারি অফিসাররা যুদ্ধের মধ্যেই কয়েকদিনের জন্য ছুটি পাচ্ছে, আর দেশের নানা জায়গায় 'হলিডে হোমে' ছুটি কাটাতে আসছে। সিমলাতেও এমনি একটা বড় আড্ডা আছে। ওদের ছুটি কাটানোর প্রোগ্রাম নাচ, অকারণে সময়ে অসময়ে নাচ একটা খুব বড় ফূর্তির খোরাক। যুদ্ধে ফিরে গেলে যে কোন সময়ই তো জাপানী গুলিতে হয়ে যাব খতম। অন্তত যেতে হবে বর্মার সবুজ নরকে অর্থাৎ মারাত্মক জঙ্গলে। তার আগে—আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে ?

তাই রজনী সুরু হবার আগেই নাচ সুরু হয়েছে। সেই চায়ের সময় থেকেই। মেরানি রেস্তোরাঁ একেবারে জমজমাট। কোন টেবিলেই খালি চেয়ার নেই একটাও। নাচের শেষে অজিতা আর তার সঙ্গী মিলিটারি যে টেবিলে এসে বসল, সে টেবিলের অন্য দুজন মিলিটারির সঙ্গে একসঙ্গেই ওরা এসেছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য কথাবার্তা সকলের সঙ্গেই সমানভাবে কইছে। হাসছে হো হো করে। সোডার বোতল যেন উপচে উঠছে। অথবা হাসি-ঠাট্টার তুবড়ি। দূর থেকে তার ফিনকিগুলো সুজিতের আঁধার মনে আলো জ্বালিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু আলো—না আগুন ? সে কথা ভেবে দেখবারও সময় নেই এই নাচের হুল্লোড়ে।

এই অজিতাকে নিয়ে সুজিত দেখেছিল স্বপ্ন—আর অজিতা সেজন্য শুধু হেসেছিল। আজও অজিতা হাসছে।

নাচের বাজনা আবার বেজে উঠল। একটা বেশ পুরনো ফক্সট্রট নাচের গান আর বাজনা। অর্কেস্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গি গায়ক গাইতে লাগল "স্টরমি ওয়েদার"—ঝড়ো আবহাওয়া।

বুকে ঝড় নিয়ে সুজিত দৃঢ় পদক্ষেপে অজিতাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সঙ্গে সে নাচতে চাইবে। নাচ মানে নাচ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সুজিত নাচতে জানে না। মিলিটারিতে ঢুকেও শেখে নি। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে যেখানে ছেলেরা-মেয়েরা ঠাসাঠাসি ধাক্কাধাক্কি করে ঘুর ঘুর করে ঘুরে যাচ্ছে, সেখানে নাচের নাম করে যদি অজিতাকে ডেকে নেওয়া যায় তাহলে কে আর

সেটা বুঝতে পারবে ? হায় ! সভ্যতার [illegible] যে দায়।

আমি আপনার সঙ্গে এই নাচটার সৌভাগ্য পেতে পারি কি মিস্ ?

অজিতা চমকিয়ে উঠল। হঠাৎ চিনতেই পারল না। যার সঙ্গে এইমাত্র নেচে এসেছে তার দিকে একবার তাকাল। ওর ইতস্তত ভাব দেখে সুজিত সেই মিলিটারিটির দিকে লক্ষ্য করে জুড়ে দিল,—অজিতা আর সুজিত বহু দিন আগেকার কলেজের বন্ধু। হঠাৎ দেখতে পেলাম। তাই আপনাদের মাঝখানে এসে বিনা পরিচয়ে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল অজিতা। বলল,—না, না, এতে কার কিছু মনে করবার নেই। ইউ আর ওয়েলকাম। তারপর বাংলায় বলল—চলে এসো।

চলে তো এল ওরা। কিন্তু নাচের সঙ্গিনীকে কোন্ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয় ? আর কোন্ হাত দিয়েই বা তার হাতখানা তুলে ধরতে হয় ? বোকা বনে যাচ্ছিল সুজিত। কতদিন নাচ দেখেছে। ঠিক বাইরে সিঁড়ির ধাপ থেকে মন্দিরের ভিতরে দেবতা দেখার মত। কাজেই ঠিকমত খেয়ালও করে নি। ওর ইতস্তত ভাব দেখে অজিতাই ঠিক মত হাত এগিয়ে দিল। নাচের ভঙ্গিতে পা চালিয়ে নিজেই সুজিতের পা চালানোকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা কোণায় সরে এল। মাথা নেড়ে বলল—নাঃ, তুমি সেই সুজিতই রয়ে গেছ। কিস্সু হবে না তোমার। ইউনিফর্মটাই মাটি।

তা হোক। কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সে তো বুঝতেই পারছি। না হলে আর অতগুলো অচেনা লোকের মাঝখানে আমায় ধাওয়া করে আস ?

উপায় ছিল না। কিন্তু আমায় একটু সময় দাও। অনেক কথা আছে।

হেসে ফেলল অজিতা। বলল—এই ভিড়েই তো কথা বলার সব চেয়ে সুবিধে। কেউ কারও কথা শুনতে পায় না।

সুজিত রাজী হল না—না, এত বাজে ভিড়ের মধ্যে নয়।

অজিতা আবার হাসল,—খুব কাজের কথা বুঝি তোমার ? তা হোক। নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলে লোকে মনে করতে পারে যে, এরা প্রেমে পড়ে গেছে।

বলতে বলতে অজিতা ঘাড় ঝাঁকিয়ে এমনভাবে হাসল যে সুজিত উসখুস করতে লাগল। নাচঘরের কোণে এক রাশ টুপি, ছাতা প্রভৃতি জড়ো করে রাখার জন্য যে প্রকাণ্ড "গাছ" সাজানো আছে—তার আড়ালে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসলে লোকেই বা কি বলবে।

শেষ পর্যন্ত বলল—বেশ তো, প্রেমে কখনও পড়তে পারি না এমন ভাব দেখিয়েই এসো, আমার টেবিলে বসবে।

না, তা হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি যে।

আমিও একজন পুরোনো বন্ধু বলে ধরে নেবে ওরা। যাই, আমিই তোমার হয়ে ওদের বলে আসি।

"ডোণ্ট্ বি সিলি।" অজিতা খপ করে ওর হাত ধরে বাধা দিল। এ হেন বোকামি করা উচিত নয়।

তবে?

আধুনিক হালচালে কি করা যে স্মার্ট ও বুদ্ধিমানের মত হবে, তা বুঝতে না পেরে সুজিত শুধু প্রশ্ন করল—তবে?

চল, ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এক টেবিলেই বসা যাবে।

চল, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা আছে। আজ রাতে ডিনারে এস আমার সঙ্গে।

না, আমার তখন রেডিওতে শত্রুপক্ষের বেতার বক্তৃতাগুলো শুনে শুনে "মনিটার" করতে হয়। রাত দশটার পর রেডিও অফিসের কাছে 'ম্যালে' অপেক্ষা করো। এক সঙ্গে হেঁটে ফেরা যাবে।

একসঙ্গে ওরা ফিরে এল অজিতার টেবিলে। অজিতা এবার ওদের সবাইকে সুজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনজনই অবাঙ্গালী মিলিটারি অফিসার।

একজন একটু তেরছা হেসে প্রজাপতি ধাঁচের গোঁফের কোণা চুমড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—আপনি বোধ হয় দিল্লীতে জি. এইচ. কিউ দপ্তরে আছেন? কোন্ "ব্রাঞ্চ" অফিসে কলম পেষেন?

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে নটবর ভঙ্গিতে সে অজিতাকে প্রশ্ন করল,—জানো নাকি জি?

জি অর্থাৎ অজিতা। একটা অর্থহীন ইংরেজী অব্যয় শব্দ। কিন্তু পেয়ারের ডাক নাম।

মুখ লাল হয়ে উঠল সুজিতের। খুব সংক্ষেপে বলল—বর্মা ফ্রণ্টে। মিলিটারি ক্রস পুরস্কার নেবার জন্য আমায় দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়েছিল।

ওঃ। মেজর এস. চাউড্রি এম. সি তাহলে এই সাদামাঠা নিরেমিষ্যি বাঙ্গালী। ছোঃ।

তিনজনেই এক জোটে পাইপ ধরানোতে মন দিল।

চারদিক চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা। তার পাশের পাহাড়ের খাদ থেকে অনবরত কুয়াশা উঠে নাচ-ঘরটাতে বাসা বাঁধছে। সে জন্যেই জি'র চোখ ছল ছল করে উঠেছে নাকি?

(২)

সেদিনও অপরাজিতার চোখ ছল ছল করে উঠেছিল।

এম. এস. সি পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। অপরাজিতা খুব ভাল পাশ করেছে। আর সুজিতও। কিন্তু পাশ করেই ওরা ভাবনায় পড়েছে। এবার কিছু একটা তো করতে হবে।

অপরাজিতার ভাবনা এই যে, আর তো স্কলারশিপের টাকা ভরসা করে খাওয়া-পড়া চলবে না। গরীবের মেয়ে। কিন্তু মাথার জোরে চালিয়ে এসেছে পড়াশুনো। এবার নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নিতে হবে। ভবিষ্যতটা কি? বিয়ে? তাহলে এত কষ্ট করে পড়াশুনো করলাম কেন? তবে মাস্টারী? ছিঃ, সে তো আরও অধম। অর্থাৎ দারিদ্র্য আর অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে বিয়ে। নীরস থোড়-বড়ি-খাড়ার সনাতন মার্কা চাপে যৌবনকে আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে পিষে ফেলা। না, নতুন কোন ভাবে নিজের পথ করে নিতে হবে। "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" অন্তত একটু হাত-পা ছড়িয়ে জীবনযাত্রা।

সুজিতেরও সেই ভাবনা। যুদ্ধ প্রায় লাগে লাগে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু তার নিজের মনে আছে সাহস। বেপরোয়া

বেহিসেবী সাহস। তারই জোরে সে সহপাঠিনীর কাছে প্রেম নিবেদন করতেও পিছোয় নি। কিন্তু কলেজে রোজ দেখা হবার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, তা এবার ছিঁড়ে যাবেই, যদি আর কোন সম্বন্ধ না গড়ে ওঠে।

অপরাজিতা আর সুজিত।

ওদের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ তৈরী হবে সে সম্বন্ধে অন্য সহপাঠীদের কোন সন্দেহ ছিল না। সুজিতের নিজেরও নয়।

তাই সে সেদিন খুব উল্লাস দেখিয়ে বলল—অপরা, এবার কেল্লা মেরে দিয়েছি। আর কোন ভাবনা নেই।

অপরাজিতা হেসে ফেলল—বেশ তো একটা নতুন নাম বের করেছ আমার। কিন্তু তোমার কেল্লা-জয় ব্যাপারটা খুবই সহজ। শুধু হাওয়ার উপর তোমার এই নয়া কেল্লা বানিয়েছ বোধ হয়।

সুজিত অনেক ভেবে-চিন্তেই নতুন নামটা বের করেছিল। বলল—সত্যি তাই, তবে হাওয়ার উপর নয়, শক্ত পাথুরে মাটির উপর। তুমি আর আমার পর থাকবে না, তাই তুমি অ-পরা। অর্থাৎ আর পর নয়। একেবারে একান্ত-ভাবে আমার।

বাঃ। তোমায় এই সহজ পথটা আবিষ্কার করার জন্য অভিনন্দন করছি। এম. এস. সি পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা মেহনতে ডক্টরেটও হয়ে গেল। শুধু নামাবলীর জোরেই তোমার স্বর্গলাভ হবে।

হবেই তো। আমাদের দুজনের সংসারে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল অপরাজিতা। বলল,—তার মানে? তার মানে...

খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে সুজিত বলল—তার মানে হচ্ছে যে আমি বেলুচিস্থানে চাকরি পেয়েছি। লুচি-পোলাও না হোক ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে দুজনের মত। আকাশে নয়—মাটিতেই। ওখানে সরকার থেকে সালফার মাইন খুলছে। যুদ্ধ বাধলে এদেশে আর গন্ধক চালান আসবে না।

একটু শক্ত হয়ে উঠল অপরাজিতা—ওঃ, সেই জন্যেই অপরা বলছ! কিন্তু বন্ধু হিসেবে আপন হলেও সংসারে যে অপরা হব সে কথা তো কখনও ওঠে নি।

এই তো ওঠালাম। আজকের বন্ধু আগামী দিনের বধূ হবে।

চুপ করে রইল অপরাজিতা। অনেকক্ষণ। অনেক কিছু ভাবল মনে মনে। সুজিত শুধু তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তা-ও চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। কি জানি, তাতে আছে কি বাণী। মুখ ফুটে যে বারণ করা যায় না, চোখ দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শেষ পর্যন্ত অপরাই নীরবতা ভাঙল। বলল—তোমার সাফল্যের দিনে আমারও কত আনন্দ হবার কথা। তুমি চাকরি পেয়েছ, নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ, মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছ। আমার কত আনন্দ। তবু সত্যি কথা আমায় বলতেই হবে তোমাকে।

সুজিত অস্থির হয়ে উঠল। যখন দুজনেই চুপ করে ছিল, তখন ছিল না কোন চঞ্চলতা। কিন্তু এখন আর নিজেকে সে সামলাতে পারল না। বলল—অর্থাৎ, তুমি আর কাউকে ভালবাস ?

খুব স্থিরভাবে উত্তর দিল অপরা—তাহলে কি তুমি জানতে না ?

হয়তো জানতে পারি নি। হয়তো তুমি জানাতে চাও নি।

তুমি রেগে গেছ সুজিত। তোমায় জানাব না, তোমায় ঠকাব—এ কথা তুমি ভাবতেও পারছ ?

সুজিত উঠে এসে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মিনতিভরা কণ্ঠে বলল—পারছি না। তাই তো বলছি তুমি ধরা দাও, হও আমার অপরা।

মাথা নেড়ে অপরা উত্তর দিল—তা হয় না সুজিত। তা হয় না। সে-ই বিয়ে করে ঘর-সংসার করে জীবন কাটিয়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট করে, এত চেষ্টা করে লেখাপড়া শিখি নি। নীল আকাশে পাখী উড়তে শিখে—সে তো শুধু খড়-কুটোর বন্দোবস্ত করবার জন্য নয়। নীল আকাশে স্বাধীনভাবে ওড়ে।

কিন্তু নীড়ও রচনা করে।

করে, কিন্তু শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্য। জীবন-ভরা নিগড় গড়ে না।

ঘরকে নিগড় মনে করছ কেন ? মানুষের রাতের আশ্রয়, দিনের বিশ্রাম, প্রাণের প্রয়োজন সে সবই কি বন্ধন ?

হেসে ফেলল অপরা। বলল—সে সব তোমরা পুরুষরা বুঝবে না। বিয়েকে

যে সত্যিই বলে উদ্বাহ-বন্ধন। হাতে হাত দিয়ে চলা যখন পাণি-গ্রহণে দাঁড়ায়, তখন সেটা যে হাতকড়া হয়ে ওঠে তা তোমরা বুঝবে না।

সুজিত সে কথা মানল না,—কিন্তু তোমার আগে আরও কত বাঙ্গালী মেয়ে, ইয়োরোপের মেয়ে অনেক শিক্ষা পেয়ে, চোখ চারদিকে খোলা রেখে বিয়ে করেছে, ঘর-সংসার করেছে। তারা কি তোমার চেয়ে কম স্বাধীনতা উপভোগ করেছে?

অপরা বলল—ইয়োরোপের মেয়েদের কথা যখন তুললে তাদের কথাই বলি। ওরা কেউ বিয়ের জন্য পা বাড়িয়ে বসে থাকে না। সংসারে অনেক দেখে, অনেক শেখে। হয়তো বা ঠকে। যখন শেষ পর্যন্ত কারো ঘরে পা দেয়, তখনও বেরিয়ে আসার পথ খোলাই থাকে।

তোমারও তা থাকবে।

হেসে ফেলল অপরাজিতা—যা বলেছ। এর পর রবি ঠাকুরের কবিতার ভাষায় বলে ফেল—

"আসা যাওয়া দুদিকেই
খোলা রবে দ্বার।"

কিন্তু দুয়ার বন্ধ যে হয়ে যায় আমাদের দেশে। দেশ, সমাজ, পরিবার সব কিছুরই আবহমান-ধারা, ট্র্যাডিশন শুধু যে মেয়েদের বেঁধেই রাখে।

সুজিত স্বীকার করল না—তোমার মত মেয়েকে কিছুই বাঁধতে পারবে না। বাঁধবে শুধু ভালবাসা, বিয়ে নয়। বাঁধবে প্রিয়ের বাহু, মন্ত্রের বাঁধন নয়।

কিন্তু সব তর্কের শেষ করে দিল অপরাজিতা—ও সব কথার কোন দরকারই নেই। আমাকে কোন কিছুই হয় তো বাঁধবে না। অথবা হয়তো কোন দিন বাঁধবে। কিন্তু তার আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন গড়ে নিতে চাই। দেখতে চাই সংসারকে নিজের চোখ, নিজের ক্ষমতা দিয়ে। এই বিশ শতকে জন্মালাম। দুনিয়ার এত খবর, এত ব্যাপারের সঙ্গে সংস্পর্শে আসছি। এত আধুনিকতা, স্বাধীনতা। সব কিছুকেই পুরো আস্বাদ করতে চাই, অনুভব করতে চাই। জানো, আমার নামটি পর্যন্ত বড় সেকেলে, বড় লম্বা। তাই ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করে ওটাকে ছেটে নিয়েছি। এখন থেকে আমার নাম হচ্ছে অজিতা। অপরাজিতা নয়—অজিতা। কিন্তু মানে একই।

(৩)

জি রেডিও অফিস থেকে বেরিয়ে ম্যালের স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে এসে দাঁড়াল।

কেন যে জায়গাটার নাম হয়েছিল স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্ট তা সুজিতা ভেবে দেখছিল। বিকেল থেকেই দলে দলে যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ় হরেক-রকমের আর বয়েসের লোক রথের মেলার মত ভিড় করে এখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। মেয়েদের পোশাক যত চটকদার ততই ছাঁটকাট। ছেলেদের সুটের স্ট্রাইপ আর টাইয়ের রঙের ফোয়ারা একেবারে হালফ্যাসানের মার্কিন ধাঁচের। কিন্তু তারা এত সব করেও জুত করতে পারছে না। যুদ্ধের বাজারে বরমাল্য পাচ্ছে শুধু ইউনিফর্ম-পরা অফিসাররা। তাদের কাঁধের উপর তারার সংখ্যা, মুকুট ও তারার পাঁচমিশেলী—এসবেই প্রমাণ হবে কে কতটা কুলীন। এমন কি চারজন কুলিতে টানা রিক্সা চড়ে যে বয়স্কা মহিলারা ককটেল পার্টি আলো করতে যাচ্ছেন তাদেরও। নজর ওদিকে। পরনিন্দা না হোক পরচর্চা নিশ্চয়ই হয় এই স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে। কিন্তু পরের কথা ভাববার সময় নেই সুজিতের।

হাওয়ার উপর দিয়ে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে গুটি কয়েক পাঞ্জাবী অফিসার। হুইশিল দিয়ে এলোমেলোভাবে বেড়াচ্ছে। বেসুরো জড়ানো গলায় দু-একটা ইংরেজী গানের লাইনও যেন গাইবার চেষ্টা করছে। লড়াইয়ের কল্যাণে আর কিছু না আসুক বিলেত থেকে এসেছে দলে দলে তরুণী—ওয়াক-আই, রেন, এনসা, ফ্যানি—এ সব নামের নানান রকম দল। তারা সবাই যুদ্ধের কাজে পুরুষের সহচারী। সহচরীও হয়ে যায় একটু ভাব হলেই। হয় অফিসের কাজে, না হয় ফ্রণ্টের ঠিক পিছনেই রেড়িও, সেন্সার বা রাডারের কাজে করে। এমন কি নেচে-গেয়ে নাটক করে আনন্দ দেবার মধ্যে দিয়েও তারা করে লড়াইয়ে সহায়তা। জানটা যদি দিয়েই দিতে হয় তার জন্যও মনকে রাখতে হবে চাঙ্গা।

তাই সিমলার স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্টে রাত দশটার পরেও ভিড়ের কমতি নেই। বেসামরিকরা সব যে যার আস্তানায় ফিরে গেছে। কিন্তু মিলিটারিদের তো অহোরাত্র জীবন দেওয়া-নেওয়ার কারবার। কাজেই জীবন উপভোগের সময়েরও সীমানা টানা নেই। "ইন বাউণ্ড" অর্থাৎ মিলিটারি লোকদের পক্ষে

বারণ নয় এমন জায়গা সিমলায় প্রায় সর্বত্র। খানাপিনার পর দিলটা আরও একটু বেশী মাত্রাতেই দরিয়া হয়ে যায়।

সামনের রেস্তোরাঁ থেকে একজন কিল্ট অর্থাৎ গামছা-মার্কা পোশাক-পরা মিলিটারি বেরিয়ে এল। বেশ রঙিন অবস্থা। বিড়বিড় করে গাইছে—"মাই বনি ইজ ওভার দি ওশেন"।

ওর বনি অর্থাৎ প্রেয়সী যদি সমুদ্রের ওপারেই থেকে থাকে সমুদ্রের এ পারে কি আর তা বলে ও দেবর লক্ষ্মণ সেজে বসে থাকবে? অতএব ও অজিতাকে কাছে দেখতে পেয়ে বেশ সচেতন হয়ে উঠল। একটু জোরেই সুরু করল—ব্রিঙ্গ ব্যাক মাই বনি টু মি। প্রেয়সীকে কাছে পাবার জন্য যেই সে হাত বাড়াল, অমনি অজিতা ঠাস করে তার গালে কষিয়ে দিল একখানা চড়। কঠিন স্বরে হাঁকল—ইউ ব্রুট।

পশু ততক্ষণে এক চড়েই চৈতন্য ফিরে পেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। দেশী মেয়ের এই রুদ্র ব্যক্তিত্ব দেখে সে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্যালুট ঠুকে বলল—দুঃখিত মিস। আমি ক্ষমা চাইছি।

দূর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এল সুজিত। তার হাতের মুঠো একেবারে তৈরী। কিন্তু অজিতা এক কথায় তাকে থামিয়ে দিল,—যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছুর দরকার নেই। না হলে একটা দৃশ্য তৈরী হয়ে যাবে।

সুজিতের কিন্তু সামলিয়ে নিতে সময় লাগল। একটু হাঁটতে হাঁটতে এগোনোর পর সে বলল,—কিন্তু তুমি তো খুব বিপদের মধ্যে কাজ কর। যে কোন দিন আবার এ রকম হতে পারে। হয়তো দল বেঁধেও আসতে পারে।

যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে অজিতা উত্তর দিল—কিন্তু তা বলে তো আর মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু তুমি কেন এ বিপদে মাথা গলিয়ে রেখেছ?

বিপদ কাকে বলছ, সুজিত? তোমরা জীবন দিয়ে দাও লড়াইয়ে। আর আমরা এতটুকু ঝক্কি নিতে পারি না? দেখেছ তোমাদের বর্মা ফ্রণ্টে কত সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়েরা বিলেত থেকে এসে তোমাদের কত কাজে কত সাহায্য করছে!

ওরা করছে দেশের জন্য।

আমি করছি নিজের জন্য। নিজের জন্যই যদি না করতে পারি, দেশের জন্য মনুষ্যত্বের জন্য কি আর কোন দিন কিছু পারব?

কিন্তু ওই পশ্চিমের মেয়েদের এ কাজ একদিন ফুরিয়ে যাবে। তারা দেশে ফিরে যাবে, সংসারে ফিরে যাবে। ঘর ভেঙ্গে গিয়ে থাকলে আবার ঘর বাঁধবে।

অজিতা চুপ করে রইল।

কিন্তু সুজিত বুঝতে পেরেছে। অজিতার মনে যে কিছু ধাক্কা এসে লাগছে—এই মৌনতা বোধ হয় তারি প্রমাণ। কাজেই সে আবার সুরু করল—ভেবে দেখ অজিতা, স্বাধীন জীবন, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তার সব কিছুরই স্বাদ তুমি পেয়েছ। কলকাতার কলেজ থেকে সিমলার অফিস সবই তো করেছ নিজে নিজে, কারও উপর নির্ভর না করে।

বাধা দিল অজিতা—এখনও নির্ভর করতে চাই না।

চাও না জানি, কিন্তু এই যে তোমার জীবন, এ শুধু বাইরে থেকেই দেখতে স্বাধীন। এ হচ্ছে কিন্তু আসলে নিজেকে মুছে রাখা। এ অস্তিত্বে তুমি পাচ্ছ কি অজিতা? তোমায় যখন অজিতা বলে ডাকি তখন তুমি আমার অনেক কিছু। আমার সব স্বপ্ন, সব ভবিষ্যৎ জড়িয়ে একজন মানুষ। কিন্তু ওই লোকগুলি যখন তোমায় জি বলে ডাকল তখন তোমার কতটুকু ওদের কাছে রূপ পেল? ইংরেজীতে জি কথাটা শুধু একটা কথার কথা। ওর মধ্যে নেই কোন রূপ, নেই কারও আপন ছাপ। তুমি যে এত বিকশিত হয়ে উঠলে সে কি শুধু এমনি একটা লেপাপোছা অস্তিত্বহীন পুতুল হিসাবে প্রকাশ পবার জন্য অজিতা?

চুপ করে রইল অজিতা। সিমলা পাহাড়ের আকাশে তারাগুলির মত তার মনেও অনেক প্রশ্নের ঝিকিমিকি চলছে। কিন্তু সে নিজে নীরব।

ভেবে দেখ অজিতা, আজ তুমি ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসাবে নাচতে গেলে। কাল ওরা আরেকজন বন্ধুর সঙ্গে যাবে। তুমিও যাবে হয়তো আর কারও সঙ্গে। কারও উপরই তোমার নেই দাবি। দায় নও তুমি কারও। কিন্তু কখনও কি তোমার মনে হয় নি যে, আজ আর বের হব না, ঘরে বসে শাল মুড়ি দিয়ে

একজনের সঙ্গেই গল্প করব ? অথবা ধর, শুধু একজনের সঙ্গেই নাচ-ঘরে যাব—না নাচলে যে মনে করবে না যে তোমার জন্য কেনা নাচের টিকিট-খরচটা জলে গেল। তোমার একলার বাসা কি ভালবাসায় দুজনের হয়ে গড়ে উঠতে পারে না ?

রাতের সিমলার পাহাড়ের গায়ে একে একে বাড়িগুলির আলো নিবে যাচ্ছে। খাদের নীচ থেকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠে আসছে ফগ। তার ভিতর দিয়ে প্রায় দেখা যাচ্ছে না আকাশের তারা বা ঘরবাড়ির বাতি।

ওই দেখ অজিতা, যে বাতিগুলো নিবে যাচ্ছে, ওদেরই মত একদিন তোমার বাইরের লোককে আনন্দ দেবার ক্ষমতা নিবে যাবে। তোমার মধ্যে তাদেরও আনন্দ পাবার ইচ্ছা ক্রমে ফুরিয়ে আসবে। জীবনভরা নিত্য নতুনের হয় না আনাগোনা। কোন একজনের মধ্যেই সেই নিত্যকালের একজন ঠিক করে নিতে হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হচ্ছে শুধু প্রয়োজন, পরিণতি নয়।

অজিতা একবার ওর দিকে তাকাল, আরেকবার পাহাড়ের গায়ে। আকাশের বুকে আর একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।

আমার সময় খুব কম অজিতা। কাল ভোরের "কন্‌ভয়ে" মিলিটারি ট্রেনে দল বেঁধে ফিরে যেতে হবে। তুমি কিন্তু আমায় এম. সি পাওয়ার জন্য অভিনন্দনও করলে না। অথচ তোমার কথা মনে না থাকলে আমার মিলিটারি ক্রসের দুর্লভ সম্মান পাওয়া সম্ভবই হত না।

অজিতার এতক্ষণে যেন হুঁশ হল। বলল—সত্যি, আমারি ভুল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা বল। কেমন করে তুমি এম. সি পেলে সে কথা বল। তুমি যে চাকরি ছেড়ে মিলিটারিতে গেছ তা ভাবতেও পারি নি। তাই এস. চৌধুরীর বীরত্বের খবর কাগজে দেখলেও, তুমিই যে সেই লোক হবে এমন একটা সম্ভাবনা খেয়াল করি নি।

থাক সে সব কথা। বর্মা ফ্রন্টের লড়াইয়ের খবরে তোমার কি হবে বল ? তুমি থাক তোমার মনগড়া পৃথিবীতে, আর আমি থাকব তা থেকে অনেক দূরে। তোমার কথা ভুলতে চেষ্টাও যদি করি, তবু পারব না।

না সুজিত, তুমি আমার কথা ভুলবেই বা কেন? তুমি চাও স্ত্রী, চাও ঘর-সংসার। সে সবের সঙ্গে আমার স্মৃতির তো কোন বিরোধ হবার দরকার নেই!

সুজিত দৃঢ়স্বরে বলল—না অজিতা, যার নেই তার নেই। আমার আছে। আমি প্রত্যেক দিন মনে করব যে তোমারি বেপরোয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা ভেবে আমি নিরাপদ টেবিল-ঘেঁষা কাজ ছেড়ে লড়াইয়ের কমিশন নিলাম। তোমারি কথা ভেবে আমার কম্যাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির বুকে চার্জ-করা জাপানী বেয়নেটের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলাম। ম্যাকেঞ্জি বেঁচে গেছে। যার ছবি তার বুকে-পকেটে সব সময় থাকে তার কাছে সে ছুটি নিয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু বাঁচলাম না আমি। বুকে বেয়নেটের প্রকাণ্ড ঘা শুকোল, কিন্তু মনটা রয়ে গেল ফোঁপরা। আমি ছুটি নিয়ে কার কাছে যাব অজিতা?

এতক্ষণে ওরা অজিতার হোস্টেলের কাছে এসে পড়েছে। ফগও ঘিরে এসেছে ঘন হয়ে। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে বন্ধ দরজা খুলে ফেলল অজিতা। সুজিত তবু তার হাত ছাড়ল না। দৃঢ়স্বরে বলল—বল, আমায় বলে যাও, আবার আমি আসব কিনা। যদি যুদ্ধে বেঁচে থাকি, যদি ফিরে আসি, তোমার মত বদলাবে কিনা। বল, বল।

কিন্তু কোন সাড়াই নেই। সিমলা পাহাড় ঘুমোচ্ছে।

রাস্তার মৃদু আলো সুজিতের ব্যাকুল মুখের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু অজিতার মুখ রহস্যের আঁধারে ঘেরা। সেই রহস্যের দিকে উদ্দেশ করে আপন মনে সুজিত কথা বলল। যেন সে অজিতাকে বলছে না। সে শুধু বলল—অল রাইট, গুড বাই, জি।

রহস্যের আড়াল থেকে মৃদু উত্তর এল,—না, না জি নয়। বল, অপরা।

বিজয়া দশমী

দেশের জন্য প্রায়ই বড্ড মন কেমন-কেমন করে। এই বিলেতের বরফ-মারা ঠাণ্ডায় হাত-পাগুলো একেবারে কালী মেরে যায়। স্যিমামার মুখ দেখি নি বোধ হয় মাস তিনেক। আর বাবা-মার কাছে আবার যে কবে ফিরে যাব তারও ঠিক নেই। মনের অবস্থাটা তাহলে কেমন তা বুঝতেই পারছেন। মনকে তো আর মাফলার-ওভারকোট চড়িয়ে শরীরের মতন গরম রাখা যায় না!

এমনি একটা শীতের রাতে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ল্যাণ্ড-লেডির মুখটা মনে পড়ল। একে দেশ থেকে ঠিক সময়ে টাকা আসে নি বলে এ সপ্তাহের ভাড়া আর খাবারের বিল মেটাতে পারি নি, তায় ঘরে ফিরে ওকেই অনুরোধ করতে হবে—কয়লা দিয়ে ফায়ার-প্লেশটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে। চুল্লীতে যদি কয়লার বদলে আমার মনকে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সম্ভবত দেশলাইয়ের কোন দরকার হবে না আজ। বুড়ীর ঠাণ্ডা চাহনিতেই জ্বালিয়ে দেবার মত আগুন থাকবে প্রচুর।

কিন্তু সেজন্য নয়। এমনিতে বাড়ির জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে ছিল। তাই সোজা ঘরে না ফিরে ডিনারটা সেরে নিতে গেলাম কাফে ইণ্ডিয়ানে। গেলাম দেরিতে। যাতে বসে থাকতে পারি অনেকক্ষণ। তার চেয়ে বড় কথা—ঘরে পেঁ ৗছে আর চুল্লী জ্বালাতে হবে না। সোজা বিছানায় গিয়ে যাকে বলে সেই পিঠের একসারসাইজ করা।

তা পিঠের ব্যায়াম ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়? আজ রাতে ঘুম আসার আশা নেই। ক্রিসমাস ইভ—কাল থেকে বড়দিনের ছুটি। সারাটা বিলেত তেড়ে ছুটে চলেছে নিজের নিজের প্রিয়জনের কাছে। আর আমি লাজুক কুণো বাঙ্গালী ঘরের ছেলে। আমি ছুটে যাব কার কাছে? তায় বাড়ি থেকে টাকা আসতে দেরি হচ্ছে।

ঝাল-মশলার সোয়াদ ছাড়া বিলেতী রোস্ট আর গ্রীল খাওয়া জিবে ততক্ষণে বেশ জল এসে গেছে। মাছের ঝোলটা—আঃ, কি ফার্স্ট-কেলাসই না হয়েছিল।

জিবের জল আর ঝাল খেতে অনভ্যাসের জন্ত চোখের জল পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কৃপণের ধনের মত খুটে-খুটে খাচ্ছি আর চুপিসাড়ে চোখ মুছে নিচ্ছি।

ততক্ষণে কাফে ইণ্ডিয়ান প্রায় খালি। রেডিওর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পাশের টেবিলে একটু টুং-টাং আওয়াজ কানে এল। তাকিয়ে দেখি—সোনার চুড়ির আওয়াজ। আচ্ছা, ঠিক জলতরঙ্গের মত মিঠে শোনাচ্ছে, না?'

ভদ্রমহিলাও আমার দিকে তাকালেন। মুখে একটু মৃদু হাসি। প্রসন্ন আভা ছড়ানো। যেন শরৎকালে আমাদের দুধন নদীর পারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাশফুল ফুটে আছে।

প্রায় একই সময়ে দুজনেই উঠে পড়লাম। বাইরে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়ছে। ওভারকোট আর টুপি ঝোলানোর 'ট্রি' অর্থাৎ গাছ থেকে তিনি ওভার-কোট তুলে নিতেই আমি ওঁর অনুমতি নিয়ে ওঁর গায়ে সেটা পরিয়ে দিলাম। দরজাটা খুলে ধরলাম, উনি যাতে আগে বেরোতে পারেন। বিনিময়ে পেলাম একটু মিষ্টি হাসি আর ধন্যবাদ।

ল্যাণ্ড-লেডির গোমড়া মুখ আর বরফ-মারা চাহনির কথা ভুলে গেলাম।

একটু এগোতেই রাস্তায় বাংলা কথা শুনে চমকে উঠলাম। সেই মহিলাই বটে! একটা ট্যাক্সি থেকে মুখ বের করে আমি কোন্ দিকে যাব জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাম্পস্টেডে যাব শুনে বললেন—আসুন না আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে। আমি যাচ্ছি প্রিমরোজ হিল। অনেকটা পথ—একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অপরিচিতা বটে, কিন্তু আমারই দেশের একজন রূপসী যুবতী। বাইরে বরফ পড়ছে বলে নয়, উনি একা যাবেনা, বাংলায় ডেকেছেন। আমি যদি এটুকু কথাও না রাখি, তাহলে বিলেতে এসে সভ্যতা শিখলাম কোথায়?

ওঁর বাড়ির দরজার সামনে এসে নামলাম। চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসছি, এমন সময় আবার উনি ডাকলেন,—আসুন না একটু ভিতরে; কফি খেয়ে যাবেন। আর সন্দেশ, নিজের হাতে বানানো। অবশ্য আপনার যদি দেরি না হয়ে যায়—

একজন নতুন চেনা যুবতী মহিলার ঘরে এত রাতে কি করে যাওয়া যায়?

কিন্তু সন্দেশ, ওঁর নিজের হাতে করা ! সেটার নেমন্তন্ন তো আর এই দূর বিদেশে ফেলে দেওয়া যায় না ?

ভদ্রমহিলার বাড়ির অবস্থা বেশ ভালই। আমাদের মত একখানা বেড-সিটিং রুম—শোয়া-বসার ঘর নয়। আলাদা একটি বৈঠকখানা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। স্বদেশী-বিদেশী কোন সামাজিক রীতিতেই আমায় দুষতে পারবে না। তিল থেকে তাল বানানোর লোকের তো আর অভাব নেই !

বিলেতে একজন সুন্দরী বাঙ্গালী মহিলা—হ্যাঁ, অবশ্যই তাকিয়ে দেখবার কথা। এখানে তো আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাতে হবে না। সহজ দৃষ্টিতে দেখলে এদেশে কোন অসভ্যতা হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একবার বৈঠকখানাটাও ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। লোকের পরিচয় ছড়ানো থাকে বৈঠকখানায়, শোবার ঘরে।

ম্যান্টল-পীসে দু খানা ছবি। দুটোরই দু পাশে সাজানো ফুলদানি। তাতে টাটকা ফুল, রোজ বদলানো হয় চারটে ফুলদানিই। ব্যাপার কি !

ভাই আর স্বামী ! উঁহুঃ। দুই ভাই ? না, তাও না। দুই বন্ধু ? হতেই পারে না। একজন চোস্ত মিলিটারি ইউনিফর্ম-পরা, আরেকজন বেশ চালাক, কিন্তু দেশী সাবেকী ঢঙের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। তবে কি জগৎসিংহ-ওসমান ? ধ্যেৎ, ভাবতেই হাসি পেল। যিনি নিজের দেশের অচেনা লোককে ডেকে নিজের হাতের তৈরী সন্দেশ খাওযান, তার সম্বন্ধে এ-সব কথাই ওঠা ঠিক নয়।

কি, হাসছেন যে মিস্টার রয় ? আমার আনাড়ী গিন্নীপণা দেখে হাসি পাচ্ছে ? তা, নিজের ঘরে চা-কোকো তৈবী করা আপনারও বোধ হয় অভ্যেস আছে ?

না, না, মিসেস চৌধুরী। আপনার কফির সুন্দর গন্ধে মনটা খুশি হয়ে গেছে, তাই।

একেবারে বাঙ্গালী মেয়ে বটে। এটুকু কথাতেই গলে গেলেন। পরের দিন অর্থাৎ বড়দিনের দিন রাতে ওর ফ্ল্যাটে এসে খিচুড়ি খাবার নিমন্ত্রণ করে ফেললেন।

মহা খুশি হয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে চলেছি। ক্রিসমাসের রাতে

এদেশে নেই হুটোপাটি, হৈ-হল্লা। স্বজনদের সঙ্গে ওরা চুপচাপ নিরেমিষ আনন্দে দিন কাটায়, সন্ধ্যা ভরে তোলে। মিসেস চৌধুরী এ-হেন রাতের জন্য আমাকে ডেকে নিলেন। এম. সি এই দুটো অক্ষর সই-করা ছবিটা বোধ হয় শ্রীমতীর স্বামীর। সি অর্থাৎ চৌধুরী। কিন্তু এম ? এম ? নিশ্চয় শ্রীমতীর ভাই নয়—আর যাই হোন, একেবারে দেশী ধাঁচের লোকের বোন হতে পারেন না তিনি।

(২)

নো ডার্লিং, নো !

হঠাৎ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

দুটো ছবির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সারা দিন ঠেসে পড়তে হয়েছে। সন্ধ্যে সাতটার সময় মিসেস চৌধুরীর দরজার সামনে ঘন্টি টিপব, এমন সময় শুনতে পেলাম ওর গলা। দরজার ঠিক ওপারেই কাকে তিনি বলছেন, নো ডার্লিং, নো !

একটু থেমে অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু কৌতূহলও কম নয়। কানে তো আর তুলো গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না ! বিশেষ করে এমন একটা কথা শোনার পরে। ছবি দুটোর কথাও মনে পড়ল।

না, আমি দেশে ফিরে আসতে পারি না। তুমি বোঝ না কেন ডার্লিং।···

এঁখনও তোমায় ভালবাসি। সেজন্যেই ফিরতে পারব না। কিন্তু সে কথা যাক।···

শুধু তোমার স্ত্রী নয়, তোমার কথা আর এমন কি আমার কথা ভেবেও আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়।...

একতরফা কথা শুনতে পাচ্ছি। তাহলে টেলিফোনেই আলাপ চলছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। টেলিফোনটা তো দরজার ঠিক পাশেই ছিল দেখেছি কাল রাত্রে। কান পেতে রইলাম।

না, 'সু'র ডাকেও ফিরব না। সে-ও আমায় খালি বলছে, ফিরে এস। কিন্তু সব চেয়ে ভাল হচ্ছে—না আসা।···

ঠিক, এটা দুর্বল লোকের কথা মনে করতে পার। কিন্তু আমি যে বড় দুর্বল মুরলী। 'সু'র কাছ থেকেও এমন কোন বল পাই নি যে তোমার ডাককে একেবারে উপেক্ষা করতে পারব।···

না, না, তাকেও ছাড়তে পারব না। আমার অসহায় মুহূর্তে সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, নিজেকে আবার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভুলো না যে তাকে আমি বিয়ে করেছি। প্লিজ, প্লিজ। আমার কথা ভাব। বি কাইণ্ড টু মি···

জানি, তোমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। 'সু'রও কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমায় এখানে একা থাকতে দাও তোমরা। আমি ফিরতে চাই না দেশে। কিন্তু হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ, ডার্লিং।

তিন মিনিট আন্দাজ কথা চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। ফিরে যাব না ভিতরে আসব এখন? দুটো ছবির সমস্যাটার উপর একটা নতুন আলো পড়েছে। একটু ভেবে দেখা দরকার।

শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করতে করতে ঘণ্টাটা টিপেই দিলাম। শ্রীমতী দরজা খুলে দিলেন। মিনিট খানেক সময় লাগল। কিন্তু যেমন প্রসন্ন হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, তাতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে মনে হল না।

বেশ ঘটা করে হৈ-চৈ করে তিনি বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন। নিজে থেকেই দুষ্টুমি করে বললেন যে, কড়িকাঠে কালকের জন্য 'মিসল-টো' ডাল টাঙানোর বন্দোবস্ত করছেন না। অর্থাৎ 'বকসিং ডে'তে অবাধ চুমু খাবার এই সুযোগটা কাল তার ঘরে থাকবে না।

হেসে ফেললাম। বাইরে এত হাড়কাঁপানি শীত, আর ভিতরে এমন মন-মাতানো উত্তাপ। ভুলে গেলাম টেলিফোনের কথা, ম্যান্টল-পীসে (আতস-খানার উপরে) সাজানো ছবি দু খানা।

বললাম—তা মিসল-টোর দরকার কি? এত ফুল দিয়ে ঘর ভরে রেখেছেন। অবশ্য আর্যপুত্রীরা সাধারণত ফুল ভালবাসেন।

আর্যপুত্রী?

হ্যাঁ, আপনাকে দেখে আমার রূপে-গুণে-মমতায় সব দিক থেকে মহীয়সী মহিলাদের কথাই মনে হয়। তাই সংস্কৃত কথাটা বললাম। কেন বললাম যে

আপনারা ফুল ভালবাসেন! ওই ভালবাসাটা উভয়ত। ফুলও তো আপনাদের ভালবাসে। দু পক্ষই সৌরভ বিলায়—তাই।

ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আপনি এ সব কথা বলে! মৃদু হেসে ফেললেন তিনি।

ভয় কেন? ফুল শুকোয়, চাঁদের কলা কমে যায়, কিন্তু শুধু মেয়েরাই দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বলেই ভাবলাম যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে প্রথম দিনের আলাপ। কি জানি কি ভাববেন। মনের কথা পড়বার কল বিজ্ঞান বের করতে পেরেছে। কিন্তু মেয়েদের মন নয়। কারণ তার যে তলও নেই, সীমাও নেই।

একেবারে কামিনীভোগ চালের সুবাস। তার উপর খাঁটি গরুর দুধের মাখন। বাঃ, এই রুইয়ের পেটি-ভাজা পেলেন কোথায়, মিসেস চৌধুরী?

উনি প্রসন্ন হেসে বললেন,—না, রুই নয়। হোয়াইটিং মাছ। স্বাদ অনেকটা এক রকম।

আর এ যে বেগুন দেখছি। বাঃ, চমৎকার বেগুন! মাশরুমের (ব্যাঙের ছাতা) চেয়ে ভাল।

হ্যাঁ, বেগুনই তো এটা। স্পেনের জিনিস। নাম ওবরজিন। বৃন্জাল ইংরেজী কথাটা ওই থেকেই এসেছে।

আদর্শ গৃহিণী আপনি। আহা, চৌধুরী সাহেব কি ভাগ্যবান! মন্তব্যটা অবশ্য ইচ্ছা করেই করলাম।

উঁনি সরমে পুলকিত হলেন কি? মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরমের কোন ছোপ না দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম,—কই, কর্তার নামে যে বড় ব্লাশ করলেন না?

ব্লাশ জিনিসটা যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন তার মেয়াদ ছিল কম। এখন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের কল্যাণে সাঁঝ থেকে রাত ভোর তক জেগে থাকে মুখের উপর। সে জন্যেই আপনাদের নজরে পড়ে না।

সত্যি, আপনি এত দিল খোলা এত সরল যে মুখের উপরই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন না. এ দেশে মেয়েরা এত সব সময় সাজে-গোজে কেন? শুধু পুরুষের নজর কুড়োতে? না, অন্য মেয়েদের হিংসা জাগাতে?

দুই-ই, দুই-ই মিস্টার রয়। আর তাছাড়া উপরি লাভ হয় আয়নায় নিজের হাসি।

একবার ওর হাসিমুখের দিকে তাকালাম। আর একবার ম্যান্টল-পীসের উপর রাখা দু খানা ছবির দিকে। কার জন্য মিসেস চৌধুরীর মুখের হাসি? কার বুকে জাগায় তা বেদনা? কার খুশির ছায়া পড়ে তার আয়নায়?

কিন্তু ভাবতে হল না। ক্রিং-ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। ওদিককার কথা অনেকখানিই শোনা যাচ্ছে। রেডিও টেলিফোন এসেছে। কলকাতা থেকে। মিস্টার চৌধুরী ডাকছেন।

শ্রীমতী চৌধুরী একবার আমার দিকে তাকালেন। একবার ম্যান্টল-পীসে ছবি দু খানার দিকে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু উনি আঙুল নেড়ে মানা করলেন। উনি করছেন এত ভদ্রতা, কিন্তু আমি অভদ্র হই কি করে?

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে যেন কিছুই শুনছি না এ রকম ভাব দেখিয়ে বইয়ের তাকগুলি দেখতে লাগলাম। খুব মনোযোগ দিযে। যেন পরীক্ষা-পাশের মন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কানে তো আর ছিপি দিযে রাখি নি!

হ্যাপি, মোষ্ট হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ ডার্লিং। আশা করি খুব ভাল আছ।···

এখানে বরফ পড়ছে বটে। তবে তুমি ভেব না। না, না, তোমায় আসতে হবে না।··

না না, না। তোমায় ভালবাসতে চাই বলেই কাছে চাই না। তুমি তো সবই বোঝ, সু।··

প্লিজ, ভুল বুঝো না। তোমার দোহাই। আরেকজনের কথা তুলো না। তাতে আমার স্মৃতি ব্যথা পায, তোমারও মনে ছায়া পড়ে। সে কথা এনোই না এর মধ্যে। একটু সময় দাও আমাকে, সু।···

ও, তোমার সঙ্গে তার মুখোমুখি কথা হয়েছে? তোমরা দুজনেই "সিলি ফুল" না হয়ে সহজ হয়ে চললে আমার পক্ষেও সহজ হয়, তা বোঝবার চেষ্ট কর, প্লিজ। আমার প্রতি অবুঝ হয়ো না।...

হ্যাঁ, সে-ও রেডিও টেলিফোন করেছিল এই ঘণ্টাখানেক আগে। তোমাদের

দুজনকেই বলছি, এস না তোমরা এখানে। টেনো না আমাকে দেশে। তাতে এ জট আরও জড়িয়ে যাবে। আমায় দূরে থাকতে দাও, প্লিজ, প্লিজ…

তুমি তো সবই জানতে। আমিও কিছুই লুকোই নি। তবু যে তুমি আর আমি বিয়ে করেছি—এটাকে একটা মানসিক পরীক্ষা বলে ধরে নাও। আমায় সাহায্য কর এ পরীক্ষায় জয়ী হতে। অগ্নি-পরীক্ষায় জয়ী হতে। তোমাদের দু জনেরই তাতে লাভ হবে। আমায় দূরে একা থাকতে দাও।…

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় খুবই মনে পড়েছে। সে কথা মনে করেই আজ নিজের ঘরে বসে খিচুড়ি রাঁধলাম।…

ঠিক, ঠিক। কোন দিন সে ঘর শুধু আমার নিজের না-ও থাকতে পারে। কিন্তু তত দিন তোমরা দুজনেই আমায় একলা থাকতে দাও। তুমি ভুলো না ওর উপস্থিতির কথা। সেও যেন না ভোলে তোমার স্বামিত্বের কথা। ওঃ, ছ মিনিট হয়ে গেল! আচ্ছা, সো লঙ্। হ্যাপি ক্রিসমাস!

সব চুপ হয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী হ্যাণ্ড মাইক্রোফোন রিসিভারটা এমন ভাবে ধরে রইলেন, যেন ও হাতল নয়, কারও এগিয়ে দেওয়া হাতটিকে তিনি ধরে আছেন। না পারছেন রাখতে, না ছাড়তে।

আমি ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওই দুটি ছবির দিকে।

মিসেস চৌধুরীর একতরফা কথাগুলি শুনে অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারলাম। মহাসাগরের এপারে দাঁড়িয়ে এক নারী, বহু আকাঙ্ক্ষার ধন বরনারী! ওপার থেকে আকাশের মধ্যে দিয়ে তাকে ডাক দিচ্ছে দু'জন পুরুষ। একজন প্রিয়, আর অন্যজন স্বামী কিন্তু অপ্রিয় নয। শুধু তাই নয়, যে প্রিয় সে স্বামী আসার আগে থেকেই এই নারীর প্রিয়। এখনও তার দিগন্তে প্রিয়ের প্রেমের বর্ণচ্ছটা মিলিয়ে যায় নি। অথচ উদয় হয়েছে আরেক জনের প্রেম। সংসারের দাবি করে তুলেছে সে প্রেমকে জোরালো। যদিও স্বামী এখনও সংসারের সঙ্গে মিশে যায় নি। দুই সূর্যের উত্তাপ সইতে পারবে কি করে এক চাঁদিনী? কাজেই সে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে সে আকাশ থেকে।

আহা!

মনে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারলাম। কিন্তু উচ্চারণ করবার সাহস

নেই। এ সম্বন্ধে কোন কথা তোলাও সভ্যতায় বাধবে। আস্তে আস্তে ছবি দুটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। যেন কিছুই শুনি নি, কিছুই ভাবি নি।

শ্রীমতীই প্রথম কথা কইলেন,—ও হো, আমায় মাপ করবেন মিঃ রয়, ভুলেই গিয়েছিলাম যে ক্রিসমাস পুডিংটা এখনও বাকী আছে। এ কি, বসুন বসুন। ওটা পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসি।

পাশের ঘর বটে, কিন্তু যেন কত দূরে। ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগল। কিন্তু যখন এলেন, তখন তার মুখে আবার পূর্ণ চন্দ্র ফুটে উঠেছে।

কিছু বুঝতে বাকী রইল না। একেবারে যাকে বলে টিপিক্যাল সোসাইটি-গার্ল। পাখনা-মেলা প্রজাপতি। এত সব নাকি-স্বরে প্রেমের কথা, দোটানার কথা অন্যকে অপরিচিতকে না শুনিয়ে বললে রস জমবে কেন? তা না হলে এর পরেও পাশের ঘরে গিয়ে মুখের চুনকামটুকু ঠিক সেরে নিয়ে এসেছে। পুডিং তো অছিলা মাত্র। এ ঘরেই এক পাশে ছিল!

ক্রিসমাস পুডিং-এর উপর নিয়ম মাফিক একটুখানি 'রাম' মদ ঢালা ছিল। তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরানো হল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে শ্রীমতীর মুখে দেখতে লাগলাম আগুনের আলো।

কিন্তু আলো ফুলঝুরির মত কথা ঝরাতে সুরু করল। আমাকে একেবারে ভাবতেই দিল না আলোর চারদিকে ঘেরা আঁধারের কথা, সংঘাতের কথা। তিনি বললেন,—দেখুন তো, বড়দিনের জন্য কি রকম একটা বাজে পুডিং এদেশে তৈরী করে! অথচ কত সুন্দর স্বাদের পুডিং করা যায়!

আমারও তাই মনে হয়। এরা ট্রাডিশনকে, আবহমান কালের ধারাকে এত আঁকড়ে পড়ে থাকে!

আশ্চর্য,অথচ এরা সব চেয়ে বেশী উৎসাহী, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে।

হঠাৎ একটু লোভ হল কথার মোড় ঘোরাতে। এর জীবনের রহস্যের উপর যে ঘন অথচ লোভনীয় পর্দা টানা আছে তা একটু তুলে দেখতে কৌতূহল তো কম নয়। তাই বললাম—সেটা ঠিক। তাদের আবিষ্কার হচ্ছে সব বাইরের জগতে। নিজের ঘরে, নিজের সংসারের মধ্যে কিন্তু ইংরেজ একেবারে রক্ষণশীল। ঘর ওরা ভাঙবে, তবু ভাগাভাগি সহ্য করবে না।

কথা কোন্ খাতে বওয়াবার চেষ্টা করছি তা তিনি বুঝতে পারলেন। মিষ্টি হেসে বললেন,—ওদের সারা জীবনটাই হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেণ্ট, তত্ত্বের সন্ধান। ভাঙবার সাহস আর গড়বার ক্ষমতা ওদের মধ্যে পাশাপাশি পাবেন। এই দেখুন না···

বলতে বলতে কথার তোড়ে উনি আমায় কত রকমের রসাল কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের বাইরের বিষয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেলেন। শুনতে শুনতে এমন এক জায়গায় এলাম, যখন উনি বললেন,—আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের পুরুষদের চোখে মেয়েদের কখন সব চেয়ে সুন্দর দেখায়?

ফস করে বলে বসলাম,—যখন মেয়েরা হাসে, লজ্জা পায়, অথবা চোখে জল এনে ফেলে!

আর তারও মধ্যে?

তারও মধ্যে বেশী যখন তার চোখে থাকে জল আর মনে ভালবাসা।

বলেই একবার ওর দিকে তাকালাম। একেবারে পুরোপুরি—যুদ্ধং দেহি ভাবে। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে আঘাত হানা, আক্রমণ করা। মন শক্ত করে নিলাম।

কিন্তু উনি সে আক্রমণকে মানলেন না। পাশ কাটিয়ে গিয়ে টিপ্পনী কাটলেন যে মেয়েদের চোখে তো জল আসে হামেশাই।

আমিও ছাড়লাম না, বললাম,—তার কারণ মেয়েরা অস্ত্র চালাতে ওস্তাদ আর সর্বদাই লড়াই করতে প্রস্তুত।

কেন? মনের ভালবাসা আর চোখের জলে আপনারা কোন তফাৎ পান না বুঝি?

পাই বৈ কি মিসেস চৌধুরী। একটা হচ্ছে বালিকার সরল ঝরণা-ধারা, আরেকটা অভিজ্ঞতার সাগর। একটা হচ্ছে তাজা, মিষ্টি; অন্যটা অনেক দিনের জমানো, নোনতা।

বলে আড়চোখে একবার ছবি দুটোর দিকে তাকালাম।

মিসেস চৌধুরী লক্ষ্য করলেন, কিন্তু আমল দিলেন না। যেন কিছুই নেই আমার চাহনিতে। এ দিকে আমি এই দুটো টেলিফোনের কথাবার্তার রহস্য,

তার ইতিহাস জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। বার বার চেষ্টা করছি একজন সোসাইটি-গার্লের মনের উপর যে ঘোমটা টানা আছে তাকে তুলে ধরতে।

ইনি স্বচ্ছন্দে হেসে উঠলেন,—বাঃ, বাঃ, মিঃ রয়, আপনার দেখি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদিও বয়স বোধ হয় কুড়ির কোঠা সবে পেরিয়েছে, কি পেরোয় নি!

গরম হয়ে প্রতিবাদ করলাম,—দেখুন, আমি শিশু নই!

আরও বেশী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি। হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে তিনি বললেন,—সে কথাটা আপনার বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। যদি অবশ্য আপনার সে কপাল হয়ে থাকে। তা স্বীকার করতেই হবে যে যৌবন তো বয়সের হিসেবে হয় না, হয় মনের মাপকাটিতে।

ওঃ, মনে হচ্ছে আপনি ব্যারিস্টারী পড়ছেন। নিশ্চয়ই খুব সফল হবেন আপনি এ লাইনে।

না, আমি ইউনিভার্সিটিতে আর্ট পড়ছি।

এবার সুযোগ এল মোক্ষম ডেপথ-চার্জ অর্থাৎ তলফোড় দেবার। দেখি শ্রীমতীর মনের সাগরে আমার এই বোমা কি তোলপাড় তোলে। বেশ ওজন করে, পুরোপুরি ওঁর দিকে তাকিয়ে, যেন ওঁকে বিশেষ লক্ষ্য করে বলছি এমন ভাবে বললাম,—শিল্পকে ফোটাতে গেলে চাই প্রেম, আর প্রেম চায় যে শিল্প সফল হোক। আশা করি আপনার জীবনে দুইয়েরই আগমনী বেজে উঠেছে।

উনি কি টললেন তাতে? দিলেন কি মনের মণিকোঠার দরজা খুলে আমায় উঁকি মারতে? অথবা বেদনায় বিবশ হয়ে করলেন সহানুভূতির প্রত্যাশা?

শুধু বললেন, আরও উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘরকে সচকিত করে বললেন,—আপনার যা অবস্থা দেখছি, তাতে শীগগির আপনার হৃদয়ে হিরোশিমার য়্যাটম বোমা ফেটে পড়বে। সময় থাকতে সাবধান হবেন, মিঃ রয়!

রাত অনেক হল। বাইরে এখনও বরফ পড়ছে। কিন্তু এত আদর-যত্নে এত খেয়ে পেট আর মন দুই-ই ভরে গেছে। শুধু এই রূপসীর মনে সত্যি কোন টানা-পোড়েন চলছে কিনা, কোন দুঃখ আছে কিনা তার গোপন রহস্যটা জানতে পারলাম না। সম্ভবত এই দুটো টেলিফোনই বড়লোক বন্ধু আর

বড়লোক স্বামীর খেয়াল হবে। ওদের যখন দুঃখ থাকে না, অভাব থাকে না, তখন এমনি করেই মনগড়া দুঃখ অতৃপ্তি বানিয়ে নিয়ে আর্টিষ্টিক বেদনা উপভোগ করে। এই শ্রীমতী চৌধুরীও নিজের সৃষ্টি করা বেদনা বেশ রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করছেন। আর্ট শিখছেন কিনা।

একেই বোধ হয় বলে সফিষ্টিকেশন, অর্থাৎ কিনা সভ্যতার ভেজাল। আরে, যেতে দাও ওসব সখের খেয়াল। রূপ আর রূপোর বাসায় এরকম হয়েই থাকে।

মন থেকে মুছে দিলাম নিজের মনে বানানো দোটানার কথা। শুভরাত্রি আর ধন্যবাদ জানিয়ে, আবার এসে খেয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম—বরফের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে।

হঠাৎ খেয়াল হল উনি সামনের ঘরের দরজাটা ঠিক মত বন্ধ করেন নি। হয়তো আর খেয়ালই করবেন না। খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই সেটা তাকে জানিয়ে আসবার জন্য ফিরে গেলাম। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি, দরজাটা সত্যি বন্ধ হয় নি। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে বলতে গেলাম সে কথা।

উনি তখন ওই ছবি দুখানার সামনে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে আছেন। দু চোখে জলের ধারা। নিঃসাড় তন্ময় শ্রীমতী চৌধুরী!

আমি কি করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে উনি খুব নীচু গলায় বললেন,—আজ বড়দিনের রাত। আমাদের বিজয়া দশমীর মত। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে হয়। তুমি এখন যাও, ভাই!

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম।

লভ নামে সেই বিলেতী জিনিসটা

গার্ডের শ্যামের বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কামরার মধ্যে লাফিয়ে উঠল ছোকরা।

দরজাটা ভেতর থেকে পাকা ভাবে বন্ধ করেই দেহলতাখানা লাগেজের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা ভাবে খেলাতে খেলাতে বাথরুমের ভেতর গিয়ে ঢুকল। অবাক হয়ে কান পেতে শুনলাম যে ভেতর থেকে ছিটকিনিখানাও বন্ধ হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় এই লম্বা রাতের গাড়িতে আমরা দুজন মাত্র যাত্রী।

তাকালাম সামনের অচেনা যাত্রীটির দিকে। দেখি যে তারও চোখে সেই একই প্রশ্ন। অর্থাৎ কে বটে এই বখা গোছের চেহারার ছোকরা?

গুণ্ডা বা ডাকাত হওয়াই সম্ভব। অন্তত বিনা টিকিটের ওস্তাদ। না হলে যে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে মাত্র দু খানা বার্থ, আর দুখানাই দখলে, সেটাতে এমন ভাবে ঝটকা মেরে কেউ উঠে পড়ে? যদি বা শেষ মুহূর্তের হঠাৎ দরকারে উঠে পড়ে, সে কি মুখের কথাটি না বলিয়ে, সোজা বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেয়?

খুব পাকা ফন্দি করেই ঢুকেছে ছোকরা। হঠাৎ দরকারের কারবার নয় নিশ্চয়ই। সামনের ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হতে লাগল যে তিনি মনে মনে হিসাব করছেন লোকটার হাতের কাগজের প্যাকেটে কি হতে পারে—ছোরা, না রিভলভার।

ভদ্রলোকের উপরই আমার সবটা রাগ গিয়ে পড়ল। যেমন চেহারা, তেমনি চরিত্র। না, না, নৈতিক চরিত্র বলছি না। অন্তত পক্ষে যখন চেনা কোন মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছি না, তখন ওর নৈতিক চরিত্র নিয়ে আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই। আমি ভাবছি ওঁর চরিত্র—অর্থাৎ কিনা ইংরাজীতে যাকে বলে ক্যারেক্টার, তার কথা।

কামরাখানাতে শুধু আমার নামেরই রিজার্ভেশন টিকিট লটকানো ছিল এতক্ষণ। তোফা নিশ্চিন্ত মনে টকটকে লাল রঙের উপর মিশ-কালো বর্ডার (পাড় বলবেন না দয়া করে—তাতে শাড়ি মনে হতে পারে) বসানো 'কসাক' পায়জামাখানা

পরে নিশ্চিন্ত মনে চুরুটটা ধরাব, এমন সময় হুড়মুড় করে কামরার ভেতরে হাজির হল তিন-তিন খানা চাপরাসী। তাদের পেছনে কমসে কম জনা তের কুলীর ব্যাটালিয়ান আর কোন্ না কোন্ তেত্রিশ দফা মোট-ঘাট। একেবারে যাকে বলে কিনা মালবাহী গাড়ি। সবার পেছনে সশরীরে খোদ গার্ড আর তস্য আড়ালে পাণ্ডব কুলের মহাবীর অর্জুনের মত হাতের বদলে গোঁফ জোড়াতে ধনুক চালানোর পোজ বাড়িয়ে আমার নয়নমণি এই ভদ্রলোক।

রেলেরই কেষ্ট-বিষ্টু কেউ হবেন। না হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে এত লটবহর নিয়ে কেউ ট্রেনে চড়ে না এই আক্রা রেলভাড়ার যুগে। খুব বিরস মুখে একবার মোট-ঘাটের দিকে, আর একবার তার মালিকের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কোন্‌টি যে বেশী সনাতন মার্কা তা বোঝা শক্ত।

বলা বাহুল্য যে দরজাটা বন্ধ করে দেয় নি কেউ। এমন কি এই ইনিও না— যদিও নিজের বাড়িতে এদের মত মালবাহকরা সম্রাট শালীবাহনের ধন আগলাবার জন্য দরজার হুড়কোতে ফালতু তালা পর্যন্ত লাগিয়ে তবে ঘুমোতে গিয়ে থাকেন।

সত্যিই রেলের কেউকেটা। আমার হাল-ফ্যাসানের বিলিতী 'কসাক' পায়জামার বর্ম ভেদ করে এগিয়ে এলেন। ফিস ফিস করে বললেন, বোধ সাফ অথচ একটু টানা বাংলাতেই বললেন যে, লোকটার মতিগতি সুবিধের নয়। গুণ্ডা তো হবেই, ডাকাতও হতে পারে। ছোরা তো আছেই, রিভলভারও থাকতে পারে।

আড়চোখে ওঁর পোঁটলা-পুঁটলির দিকে তাকাচ্ছি দেখে ক্ষমা চাইবার সুরে বললেন—জানি, আমার এত মাল দেখেই বোধ হয় এই কামরাতেই ঢুকে পড়েছে, আর মালের জন্যেই দরজাটা বন্ধ করার সুবিধে ছিল না। সে যাই হোক, এখন কি হবে মশায়?

দিন না চেনটা টেনে! পরামর্শ দিলাম আমি।

আরে রাম রাম! আমি রেলের 'অফসার' হয়ে চেনটা টেনে দিই, আর এই ডাকু পকেট থেকে একটা টিকিট বের করে দেখিয়ে দিক। তখন আমার ইজ্জতটার কি হবে বলুন তো! আপনার সেই স্লিংস থেকে সুরু করে সব কাগজে বড় বড়

হেড লাইন বের হবে আর আমায় হেডটিও যাবে। প্রমোশন আর হবে না তাহলে কখনও।

ভয়ের চোটে ভদ্রলোক মরমের কথাখানি বের করে ফেলেছেন অজানতে।

হেসে বললাম—মশায়, প্রমোশন আগে, না প্রাণটা আগে?

সে কথা কানেই তুললেন না তিনি। শুধু অনুনয় করে বললেন যে, আমরা দুজনেই যদি খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকি তাহলে একটা গুণ্ডা নিশ্চয়ই কিছু করতে সাহস পাবে না। বর্ধমানে ট্রেনটা থামলেই তিনি গার্ডকে ওর টিকিট চেক করতে বলবেন আর অন্য কামরায় সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন। শুধু ততখানি সময় দুজনে সাবধান থাকতে হবে।

কিন্তু সময় যে আর কাটে না।

ছটফট করতে করতে ভদ্রলোক আমার বার্থে এসে বসে পড়লেন। ফিস ফিস করে ফাঁস করে দিলেন—যদিও তার দরকার ছিল না—যে তিনি সত্যি সত্যিই রেলের একজন বড় অফিসার, আর তিনি অন্য সব রেলের যাত্রীদের কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছেন যে শুধু গার্ড নয়, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যে সিপাইরা যায়, একেবারে তাদের দিয়ে ছোকরাকে চেক করিয়ে তবে ছাড়বেন।

অর্থাৎ যেমন বুনো ওল বলে মনে হচ্ছে, তেমনই বাঘা তেঁতুলের বন্দোবস্ত তিনি করবেন। এখন বাছাধনকে শুধু বর্ধমান পর্যন্ত সামলাতে পারলেই হয়।

এমন সময় হঠাৎ বাথরুমের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল ছোকরা। ভদ্রলোকের হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনায় তাঁর বুকের ধড়ফড়ানি পাশে বসা আমার কানে ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে এসে পৌঁছল। ভুরু কুঁচকে কপালে উঠে গেছে দেখলাম।

তা যাবারই কথা। বাবরী ছাঁটের মাথা বংশীধারী ধাঁচে এক কোণে হেলিয়া ছোকরা ভদ্রলোকের পাতা বিছানার উপর দিব্যি বসে চোখ আধ-বোঁজা করে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক চোখের কোণা দিয়ে আমায় যা বোঝাতে চাইলেন, তার অর্থ হচ্ছে যে—সাবধান, ওই সব কবি-কবি পোজে ভুলবেন না। হঠাৎ হামলা করতে পারে।

ছোকরা আধ-খোলা চোখে তাকিয়েই রইল। আমাদের খুব কড়া ভাবে নজরে রাখছে, না নিজের ভাবনায় ডুবে আছে বোঝা শক্ত। সবটাই বোধ হয় ওর ঢঙ—এমন কি ওর ফুলবাবু-মার্কা পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে উঁকি মারছে যে নীল রঙের খামটা ওটা পর্যন্ত।

এদিকে ভদ্রলোকের কপাল কুঁচকে একেবারে ত্রিশূল মেরে রয়েছে। যদি ছোকরা আগে-ভাগেই একে সাবড়ে না ফেলে, তবে উনি যে বর্ধমানে ট্রেন এলেই ভয়ানক মারাত্মক রকম কিছু একটা করে বসবেন তাতে সন্দেহ রইল না।

বর্ধমানের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামতে না থামতেই ছোকরা লাফিয়ে পড়ল কামরা থেকে। ছুটে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা তরুণী মেয়ে। একেবারে জড়িয়ে ধরল ওর দু'হাত। এত রাতেও আশে-পাশে যে লোক থাকতে পারে সে কথা ভুলে মেয়েটি প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল—ডার্লিং, ডার্লিং, তুমি এতদিনে এসে পৌঁছলে, ডার্লিং। ডার্লিং ডার্লিং শব্দ দূরেও যেতে লাগল। ভাবের আবেগে মেয়েটি বোধ হয় আর কিছুই বলতে পারছিল না।

এদিকে সহযাত্রী তো লম্ফঝম্প করে গার্ড, সিপাই সবাইকে জড়ো করে ফেলেছেন। মায় তিন-তিন জন সঙের মত চাপরাসী পর্যন্ত। উত্তেজনায় ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন—ডাকু, চোট্টা, টিকিট চেক করো।

আরও বেশী উত্তেজনায় ওরা কাঁপতে কাঁপতে দাপাদাপি সুরু করে দিল—বাতাইয়ে হুজুর, ডাকু কিধার হ্যায়। কৌন্ হ্যায়।

আমাকেই না সন্দেহ করে বসে এরা।

কারণ এদিকে ভদ্রলোক চুপ মেরে গেছেন হঠাৎ। না কন কথা, না দেন জবাব। একেবারে চুপ।

শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে বললেন,—সরি, আই য়্যাপলজাইজ, ভুল হয়েছিল।

আর কি সব বিড় বিড় করে বলতে বলতে তিনি মাথা নীচু করে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। শুধু একটা কথা বুঝতে পারলাম—সেই বিলেতী জিনিসটা।

কি করব বুঝতে না পেরে সব দরজা জানালা দেখে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বসে পড়লাম। ভদ্রলোক ওপাশ ফিরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছেন।

(২)

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

দেখি যে ট্রেনটা থেমে আছে। কোন খোলা তেপান্তরে লাইন খারাপ হয়ে আছে দেখে ট্রেনটা চলছে না। এদিকে গরম লাগাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সঙ্গী ভদ্রলোকও দেখি জেগে চুপচাপ বসে আছেন। একটুও ঘুমিয়ে ছিলেন বলে মনে হল না। ওর টিকিটি এখনও তেমনি পরিপাটিই রয়েছে দেখলাম।

মনে পড়ল—সেই তখন বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন। শুধু একটি বিলেতী জিনিসের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আর অমন তোড়জোড় করে সিপাই চাপরাসী জড়ো করে শেষ পর্যন্ত ছোকরাকে দাঁড় করিযে একটু জিজ্ঞাসাবাদও কেন করালেন না সে কথাও মনের মধ্যে ছিল। তাই এখন চেপে ধরলাম।

একটুখানি চুপ করে থেকে আমার স্যুটকেশের পাশে লটকানো লেবেলের উপর চোখ রেখে তিনি আমায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন—আপনি স্কটিশচার্চ কলেজে অমুক বছরে বি-এ পড়তেন কি?

অস্বীকার করলাম না।

কিন্তু তার সঙ্গে আজ রাতের ব্যাপারটার সম্পর্ক কি?

সে কথা তিনি কানে তুললেন না। বললেন—আত্মারামকে মনে আছে আপনার?

একটু ভেবে নিতে হল। পরে মনে পড়ল। ওঃ, সেই যে—যাকে আমরা খাঁচু বলে ডাকতাম।

খাঁচু অর্থাৎ খাঁচাছাড়া। আত্মারাম ঝাঁকে এই আদরের ডাক নামে সবাই ডাকত। ওর যে বাপ মাযের দেওয়া একটা নাম ছিল সেটা আমরা প্রায় ভুলেই গিযেছিলাম। তখনি ভুলে গিয়েছিলাম।

খাস কুলাউনের সনাতনপন্থী লোক। ভোরবেলা বড়বাজারের পাড়া থেকে রোজ হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে। একাদশী, অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ এসব সর্বদাই লেগে আছে। পেঁয়াজটা পর্যন্ত ব্রজের আলু নামেও চলে না ওদের বাড়িতে।

এ হেন আত্মারামের এক দেশের একআত্মা বন্ধু ছিল ব্রিজমোহন চতুর্বেদী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল। এই সেই ব্রিজমোহনই নিশ্চয়। যাকে আমরা হাওড়া ব্রিজ ওরফে হাওড়া বলে ডাকতাম। ওদের মুলুকে ব্রজকে ব্রিজ বলে ডাকার রেওয়াজ আছে তা জানতাম না।

নিষ্ঠুরভাবে আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে দুই টিকিতে পর্যন্ত ওদের অভিন্ন থাকা উচিত। স্বামী-স্ত্রী তো নয় যে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া যাবে। তাই নিদেনপক্ষে টিকিছড়া লুকিয়ে চুরিয়ে কোনরকমে বেঁধে দেওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছার অন্ত ছিল না।

কেবল দু'জনের হিমালয়-মার্কা গড়ন-পেটন দেখেই আমাদের হাড্ডিসার টিঙটিঙে হাতগুলো এ হেন সাধু কাজে এগোতে সাহস পেত না।

সেই খাঁচু মারা গেছে থাইসিসে। সংক্ষেপে ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক। থাইসিসে—লভ করে থাইসিসে মারা গেল।

লভের সঙ্গে থাইসিসের কি সম্বন্ধ বুঝলাম না। কলকাতার বাঙ্গালী পাড়াগুলোর গলিতে গলিতে যাদের যক্ষ্মায় ধরে, তারা যে সবাই প্রেমে পড়ে যক্ষ্মায় পড়ে এমন মনে করার তো কোন কারণ নেই। উহুঃ বুকে কত বেদনা —বলে বুকে হাত দেওয়া আর কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরা তো এক জিনিস নয়।

চারদিকে রাতটা বড় গভীর হয়ে জমাট হয়ে ঘিরে এসেছে। আকাশে একটা তারাও জেগে নেই। খাঁচুর টিকি দোলানো কদমছাঁট-মার্কা গোলগাল মুখের মধ্যে যে অবোধ সরল চোখ জোড়া ভেসে থাকত তারাও মুদে গেছে।

কিন্তু এ হেন সুশীল সুবোধ, যাকে বলা যায় একেবারে নাবালক, তার এ রকম পরিণতি কেন হল তা জানতে খুব কৌতূহল হল। অথচ মনটা এত খারাপ লাগছে যে জিজ্ঞেস করতেও মন সরে না।

'লভ' আর যক্ষ্মা এ দুটোর কোনটাই ওই স্বাস্থ্যবান, বিবাহিত নিরীহ লোকটি সঙ্গে খাপ খায় না।

ব্রিজমোহনেরও মনে নিশ্চয়ই সেজন্য খুব ব্যথা হয়ে আছে। সেজন্যই বোধ হয় সেও ওই খবরটুকু দিয়েই চুপ করে রইল।

আমি আস্তে আস্তে তার বিছানায় এসে বসলাম।

সহানুভূতির এই সাড়াটুকু পেয়ে ওর মন যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মেঘ যেমন করে ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ে।

আপনার কি খেয়াল আছে আমাদের সঙ্গে সেই যে মেয়েটি পড়ত? সেই যে শ্যামবর্ণ ছিমছাম চেহারা হাসিমুখ মেয়েটি!

মুস্কিলে পড়লাম। বাঙ্গালী মেয়ে কলেজে নতুন ঢুকেছে—এমন মেয়ের প্রায় সবাই তো শ্যামবর্ণ, ছিমছাম হাসিমুখ হয়ে থাকে। তা দিয়ে কি আর লোক চেনা যায়? তার চেয়ে যদি বলতেন—খুব ফর্সা, বা দাঁত উঁচু বা হাই হিল তাহলে না হয় সনাক্ত করা যেত।

কিন্তু কুমায়ুন পাহাড়ের ঘাটি আর্যরক্তের এই টকটকে ফর্সা ভদ্রলোকের কাছে এই বর্ণনাটুকুই যথেষ্ট। ওদের ঘরে ঘরে গৌরী-মেয়েরা মুখে কোন ভাব বা ইচ্ছার ছাপ ফুটিয়ে তোলা দরকার মনে করে না; চায় না বসনে-ভূষণের সামান্য টুকিটাকিতে নিজেদের ফিটফাট করে ফুটিয়ে তুলতে। ওদের জগতে তাই একাকিনী কোন শ্যামা বাঙ্গালিনী য্যাটম বোমার মত চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদের নিজেদের মেয়েরা সেই চোখ-ধাঁধানো আলোর সন্ধান জানে না।

ব্রিজমোহনের লটবহরের দিকে এক চোখ নজর দিলেই বোঝা যাবে যে কোন আধুনিকা বাঙ্গালিনী তার স্বামীর বাক্স-বোচকা এমন ভাবে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরবার মত বন্দোবস্ত করত না। তার নিজে হাতে সাজানো মালপত্রের মধ্যে একটু হালের বিলেতী ছোঁয়া থাকত। থাকত দামী শতরঞ্জি-মোড়া বিছানার বদলে একটা হোল্‌ড্-অল; চকচকে পেতলের টিফিন ক্যারিয়ারের বদলে দ্বারিকের সন্দেশের বাক্স। আর নগদ তেত্রিশখানা মোটঘাট? নেভার, নেভার।

এ হেন ব্রিজমোহনের বন্ধু আত্মারাম ঝাঁ ঘরে ফর্সা ঘোমটা-পড়া কিশোরী বৌ রেখে কলেজে শ্যামলা আঁচল-দোলানো তরুণী সহপাঠিনীর দিকে তাকিয়ে থাকত।

কবিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে লিখে গেছেন—"চোখের দেখা মুখের হাসি কে করেছে মানা?"

কথাটা মনে পড়ল। তাই সুবিধা মাফিক ঝেরে দিলাম ব্রিজের উপর।

ব্রিজ কিন্তু আমল দিল না কবিতাটাকে। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র প্রায়

খেপে উঠল। বলে উঠল—হ্যাঙ্‌ ইয়োর বেঙ্গলী পোয়েট্রি। ওই করেই তোমরা গোল্লায় গেছ!

অবশ্য একমত হলাম। রসগোল্লার রস যারা পেয়েছে তারা রসের সন্ধানে গোল্লায় যেতে সব সময়ই তৈরী আছে। আর প্রেমের রস? ওরে বাবা, সে যে একেবারে যাকে বলে কিনা আদিরস।

কাজেই মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কিন্তু সায় দিল না ব্রিজ। সে চেপে ধরল আত্মারামকে এই সর্বনাশা নেশা ছাড়াবার জন্য। চোখের নেশার চেয়ে বড় নেশা নাকি আর নেই।

একথা বলাতে আমাদের সেই সরল অবোধ নাবালক খাঁচু নাকি গুনগুনিয়ে উঠেছিল—'আঁখি মোর ঘুম না জানে।'

ব্রিজ তাকে খুব ভারিক্কি ভাবে সদুপদেশ দিল—ভাই, এসব আঁখকা কারবার ঘরানার সঙ্গে কর। ঘরও সুখে থাকবে, তুমিও শান্তি পাবে। তোমার ঘরে বৌ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে। কলেজে পড়া বাঙ্গালী মেয়ে তোমার দিকে তাকাবেও না। আর ওর দিকে তাকাবার মত আছেই বা কি? কোথায় লাগে মানসী সেন পদমকুয়াঁরীর কাছে?

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল মানসী সেনকে। হ্যাঁ, আধুনিকা অবশ্যই। চলনে, বলনে, বসনে—সব কিছুতেই। কিন্তু ভেসে যাওয়া হাল্কা মেঘের মত মেয়ে মানসী সেন খাঁচুর আত্মাকে শ্যামল করে তুলল কি করে?

ব্রিজ ওকে বুঝাবার চেষ্টা করল—ভাই, ওই মেঘবরণী মেয়ে শুধু মেঘ নয়, বিদ্যুতও হানতে পারে, যদি টের পায় তোমার মনের কথা। তোমার কোন লাভও হবে না, সুবিধাও হবে না। ও পথ ছাড়।

কিন্তু আত্মারাম কোন কথাই শুনল না। সোজা এগিয়ে গেল নিজের মন যেদিকে টানছে সেদিকে। সে সব কথা আপনাকে বলবার সময় নেই। শুধু এটুকু বলছি যে ওর বাড়িতে ওর মনের এই বদলে যাওয়া প্রথম টের পেল ওর কিশোরী স্ত্রী।

ব্রিজের কথায় একটু বাধা দিলাম। বললাম—কেন, আমি অবশ্য বেশীদিন আপনাদের সঙ্গে পড়ি নি, কিন্তু খাঁচুকে যতটুকু দেখেছি তাতে তো মনে হয়

না যে ও কারও মনে কষ্ট দিতে পারে। আর মুখ ফুটে মনের কথা বৌকে বলে বসবে এমন লোকই সে ছিল না।

তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু মুস্কিল তো সেখানেই। যে যত কম কথা কয়, তার ব্যবহার তাকে তত বেশী ধরিয়ে দেয়। আর ওর মত গম্ভীর প্রকৃতির লোক কাউকে যদি ভালবাসে তাহলে একেবারে তাতে ডুবে যায়। নিজের কাছ থেকে যে স্বামী সরে যাচ্ছে তা ওর বৌ খুব সহজেই টের পেয়ে গেল। বিশ বছরের ছোকরা স্বামীর প্রেমে ভাটা পড়া বুঝতে পারা আর এমন শক্ত জিনিস কি?

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম—মানসী সেন কি খাঁচুকে কোন সাড়া বা উৎসাহ দিয়েছিল?

বেশ খানিকটা ঝাঁঝ দিয়ে জবাব দিল ব্রিজ,—সেখানেই তো আরও বেশী মুস্কিল হল। আপনাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মন বোঝা ভার। না হয় একটু সাড়াই দিযে দে না বাপু। তাহলে আত্মাও ঠাণ্ডা থাকে, ঘরও ঠিক থাকে। মানসী, না হাতী। ও মেয়ে কোনদিন কারও মানসী থাকতে পারবে না। এক্কেবারে জাঁহাবাজ।

অর্থাৎ?

গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে ব্রিজ বলল—অর্থাৎ আপনারা যে বলেন, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' তাই। সাফ জবাব দিযে দিলে বরং কিছু হিল্লে হতে পারত। উল্টে হেদোর পারে দু-এক চক্কর ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত, আর বেচারা তার পর আরও বেহুঁশ হযে যেত।

প্রতিবাদ করলাম আমি। বললাম—তাতে তো একটু টনিকের কাজই করবার কথা।

পুরুষ্টু গোঁফ জোড়ায় তা দিযে ব্রিজ বলল—তা আমার মত লোকের বোধ হয় তাই হত। কিন্তু আত্মারাম শেলী কীটসের কবিতা একটু বেশী পড়েছিল। বিলিতী নভেলও পড়েছিল মন্দ না। তার উপর জুটল আপনাদের ওই রবি ঠাকুর।

তাতে লোকসান কি? প্রশ্ন করলাম আমি। সে তো একটু-আধটু আমরা সবাই কাঁচা বয়সে করে থাকি।

কিন্তু লভে তো পড়েন না! সেটাই যে ওর কাল হল। যখন থেকে বুঝতে আরম্ভ করল যে কোন চান্সই নেই তখন থেকে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। শরীরের যত্ন করে না, ঘুমায় না। বাড়ির সবাই চাপাচাপি করলে চুপি চুপি গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। অমন ফর্সা লম্বা-চওড়া চেহারা কালো শুটকো হয়েগেল।

গঙ্গার কথা তোলাতে একটু ঠাট্টা করার লোভ হল। প্রেমের ব্যাপারই এই। নিজে প্রেমে পড়লে হয়তো লোকে মারা যাবার দাখিল হয়; কিন্তু অন্যকে প্রেমে পড়তে দেখলে বড় মজা লাগে। আকণ্ঠ-প্রেমে যে ডুবে গেছে তার পা ধরে টানাটানির মত মুখরোচক জিনিস আর নেই।

তাই বললাম—পবিত্র গঙ্গার ঘাটে বসেও পবিত্র দাম্পত্য কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়ল না—আশ্চর্য তো!

ব্রিজের ততক্ষণে এসব ঠাট্টায় চটে উঠবার মত মনের অবস্থা নেই। কথাটায় নজর না দিয়ে সে আত্মারামের অসহায় মনের অবস্থার কথা বলে চলল। সত্যিই অসহায় অবস্থা। সাধারণ জীবনে এমন ব্যাপার হয় না। কত লোকেই তো বিফল প্রেমে কষ্ট পায়, কত চোখের জল ফেলে, আবার তা মুছে নতুন করে হাসে। কিন্তু সিরিয়াস অথচ লাজুক লোকরা প্রেমে পড়লে সর্বনাশ।

বাড়ির লোকদের এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ প্রায় অত্যাচারে দাঁড়াল। ঘন ঘন ব্রিজমোহনের ডাক পড়ে বন্ধুকে সমঝিয়ে সামলাবার চেষ্টা করবার জন্য। কলেজ থেকে নাম কাটাবার জন্য দরখাস্ততে সই করানো গেল না ওকে দিয়ে। টার্মের মধ্যে কোন ওজুহাতে চেঞ্জে নেওয়ানো গেল না। এমন কি শ্বশুরবাড়িও না। শেষ পর্যন্ত রাতে ঘুমাবার জন্য ও সদরে বৈঠকখানায় এসে আশ্রয় নিল।

বাধা দিয়ে বললাম—সে কি? এ রকম করে কি কারও মন ফিরে পাওয়া যায় নাকি? আপনারা এসব করলেন কি?

ব্রিজ বলল—আরে মশাই, আমরা বিলেতী ঢঙে মনের কারবার করলাম কখন যে এসব রোগের ঠিক দাওয়াই বাৎলাতে পারব? আমাদের কোন মেয়েকে নজরে ধরলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কি না সে খবর করি। জাতে কুলে যদি না মিলল তাহলে সুবিধা থাকলে আরও বেশী সুন্দর কোন মেয়ের খবর করি। না

হয় তাকে লোপাট করে নিয়ে আসা যায় কিনা ভেবে দেখি। তা বেটা ইংরেজদের রাজত্বে সে পথটাও বন্ধ।

তা আপনারা কি করলেন ?

একদিন সবাই মিলে ধরে বেঁধে আমায় মানসী সেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। না, না, ঘটক করে নয়, ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আত্মারামকে ছাড়াবার জন্য। আরে মশাই, আমারি আত্মারাম একেবারে যায় আর কি ! এমন বেণী দুলিয়ে মা মনসার মত তেড়ে এল মানসী।

তার পর ?

তার পর মানসী ওকে দেখলেই ফেটে পড়ে। ও কিন্তু খুব মুষড়িয়ে পড়ল আরও বেশী। নিজেকে আরও বেশী কষ্ট দিতে লাগল। বলুন তো আপনি আমি হলে কি এ সব করতেম ?

আপনি আমি কি করতাম সে প্রশ্ন এড়িয়ে আত্মারামের কথাতেই ফিরে যেতে চাইলাম। বিশেষ করে যখন ব্রিজের মতে সে আপনার আমার মত বেরসিক না থেকে বিলেতী লভ করেছে।

ব্রিজের মাথায় রেলের সিগন্যালের মত টিকিখানা এখনও উঁচু হয়ে আছে। এত বছর বড় চাকরি করেও নীচু বা লোপাট হবার কোন লক্ষণ নেই। সম্ভবতঃ সংস্কৃতটা ভালই জানবে।

তাই ঝেড়ে দিলাম সংস্কৃত কাব্যের কথা। ওর বার বার বিলেতী লভের উপর জোর দেওয়াটা ভাল লাগছিল না। বললাম—আপনি যদি সংস্কৃত পড়েন তাতে কত প্রেমের কথা পাবেন। সেটা এমন কিছু বিদেশীও নয়, নতুনও নয়। এই মনে করে দেখুন না, একজন মেয়ে কবি যেমন লিখেছিলেন যে, রেবা নদীর পারে বেতসী তরুর তলায় তার মনখানা দেওয়ানা হয়ে উঠেছিল।

তেড়ে জবাব দিল ব্রিজ। বলল—আরে সে কথা ছেড়ে দিন। যার জন্য কবির মন দেওয়ানা হয়েছিল সে যে তার কৌমার্য হরণ করেছিল। আত্মারাম বেচারার তো সে হিসাবে স্ত্রীর জন্যই দেওয়ানা হওয়া উচিত ছিল।

তোবা ! তোবা !

সোহো

সোহো। অর্থাৎ যাকে বলে কি না বোহেমিয়ানদের স্বর্গ।

ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা। সেই সোহোতে এসে হাজির হয়েছি আমি। এত সব রকম লোক থাকতে আমা হেন রেস্‌পেক্‌টেবল অর্থাৎ মানী ভদ্রস্থ বৃদ্ধই কি না এসেছে সেখানে! প্যারিসেও নাকি মোমার্তর কি ওই রকম নামের একটা পাড়া আছে। সেখানেও এই সব আজব চীজদের সন্ধান মিলবে বলে খবর পেয়েছি।

কিন্তু আমি তো আর ফরাসী ভাষা জানি না। বুঝি না ওদের কথাগুলোর মধ্যে অত ঢঙ করে হঠাৎ হঠাৎ দন্ত্য-স দন্ত্য-নগুলো বেমালুম লোপাট করে দেওয়া। যারা কথাবার্তার মধ্যেই এমন সব ছলাকলা ছড়িয়ে রেখেছে, তাদের কাজ-কারবারই আলাদা। সেখানে যেতে ভরসা পাই না। তাই ভাবলুম একবার সোহোতেই না হয় ঘুরে আসি। হাতে-নাতে দেখে যাই বোহেমিয়ান বস্তুটা কি রকম। গিন্নীর অর্ডার আছে।

যাকে তাকে আবার শুধোনো যায় না। কি না-জানি ভেবে বসবে। তাই চারদিকে তাকিয়ে একটু একলা পেয়ে হাই কমিশনারের অফিসের বুড়ো লিফটম্যান সাহেবটিকেই জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাসনাটা খোলাখুলি নিবেদন করলাম। ঠিকানা বাৎলাবার সময় বুড়ো একটু তেরছা ভাবে হেসেছিল।

তা অমন কত মেমসাহেবও তো আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু-আধটু ফিক করে হাসে। যত বয়স কম, হাসির রকমফেরও তত বেশী।

মানে, ভারী বজরার চেয়ে পানসীই তো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায় বেশী।

তা বাপু, আমার অত-শততে কি কাজ? অবশ্য এই তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকার কাছাকাছি সময়ে প্রথম বিলেতে এলাম। কিন্তু বয়সটা পড়তির মুখে হলেও লোহার কারবারটা খুব উঠতি। কাজেই দেশটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখব না? অবশ্যি খরচাটা বড্ড বেশী, আর শীতও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

চলেছে। তবু ছেলেমেয়েগুলো ওভারকোট কমফর্টার না পরে কেমন করে দৌড়াদৌড়ি করে, ঘোরাঘুরি করে—বুঝতেই পারি না। মেয়েগুলোর আবার না লাগে শীত, না লজ্জা।

তাই দেখছিলাম বসে বসে। একটা ছোট্ট দেখে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিলাম। প্রথমে ছোট্ট দিয়েই সুরু করা যাক। ব্যাপারটা বুঝে রাতে গিন্নীকে চিঠি লিখতে হবে। ওরই এ-সবে সখ একটু বেশী কি না। সব জানাতে হবে, মায় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা বইয়ে পড়া সোহোর কাহিনী পর্যন্ত। না হলে আমি আর এই বয়সে···

বছর পঁয়ত্রিশের এক ছোকরা, আমাদের দেশেরই নিশ্চয়, রেস্তোরাঁয় ঢুকেই আমার দিকে এক চোখ তাকিয়ে নিল। কেন রে বাবা, আমার দিকে তুমি কেন? চেহারাতেই তো মালুম দিচ্ছে আমি তোমারি দেশের লোক। মিছে কেন নজর দিয়ে আমায় জেরা সুরু করেছ?

পাশের টেবিলটায় বসে ওয়েট্রেসকে খুব গম্ভীর ভাবে অর্ডার দিতে সুরু করল। চাই বয়েলড এগ্‌স,—এত কড়া সিদ্ধ যে হাতুড়ী ঠুকে ভাঙ্গতে হবে। চাই কড়কড়ে টোস্ট—ভাজতে ভাজতে রঙ কালো হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে জলো চা।

আমি তো অবাক! হরি, হরি! ছোকরা বলে কি? দিন-দুপুরেই সুরু করে এসেছে না কি? লাল পানির পরে চায় বোধ হয় জলো চা! কোন নয়া রসিকতা হবে বোধ হয়।

ওয়েট্রেসও একেবারে হাঁ। মুখে পেন্সিল গুঁজে একটুখানি তাকাল। তার পর হেসে ফেলে বলল,—আজ বিকেলে রোদ উঠি উঠি করছে। বসন্তকাল এই এসে পড়ল বলে, না স্যার?

ছোকরা, মানে আমার দেশের এই খদ্দের, গলায় টাইয়ের বদলে বেঁধেছিল হালফ্যাসানের একটা রেশমী চৌকো রুমাল। তার ফাঁস আরও একটু টানতে টানতে সংক্ষেপে শুধু বলল,—আমি ঠিক এই রকমই চাই। একেবারে এই রকম, বুঝলে?

ইয়েস স্যার! বলে ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটা চলে গেল। ছোকরা ইয়া লম্বা একটা পাইপ বের করে তাতে ধোঁয়া ফুঁকতে লাগল। যেন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছে। একটু নজর রাখলাম।

ওয়েট্রেস ট্রে থেকে অর্ডার-মাফিক জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল। ঠোঁটের উপর চেপে রাখল একটু মুচকি হাসি। তারপর মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে বলল, —আরও কিছু, স্যার ?

হ্যাঁ, এই বার সামনের চেয়ারটা টেনে বস। বসে খুব করে আমায় কথা শোনাও। প্রাণ ভরে। একেবারে যা খুশি মনে আসে।

মেয়েটা দিশেহারা হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে পেন্সিলটা আবার মুখে গুঁজে দিল।

বুঝলে না, মিস ! আমি একটু আগাম রিহার্সাল দিয়ে নিতে চাই। সেজন্যেই অনুরোধ করছি।

খদ্দেরকে খুশি করাই ওদের নিয়ম। চোখ-মুখ ভার করে কাজ করলে ওদের দেশে চলে না। মেয়েটা হেসে বলল,—ওঃ, আপনি বুঝি হলিউডের কোন ফিল্মস্টারের সঙ্গে সংসার করবেন ভাবছেন, স্যার ? হাউ ফানি !

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ছোকরা বলল,—না, না। আমি গত যুদ্ধে লড়েছি এবং এখন হাতে অনেক কাজ। আবার দ্বিতীয় বার যুদ্ধে নামা আমার পোষাবে না।

ঠিক বলেছেন ; অত্যন্ত বিজ্ঞের মত কথা। তবে বোধ হয় আপনি এই প্রথম নিজে ফ্লাট চালাবার বন্দোবস্ত করেছেন—তার রিহার্সাল দিচ্ছেন !

বলতে বলতে মেয়েটা হেসে গড়িয়ে গেল। কিন্তু আরও অনেক খদ্দের চারদিকে আছে। যেন তাদের পরিবেশন করতে হবে এমন একটা ভাব দেখিয়ে মাথার সাদা লেসের টুপিটা এঁটে বসাতে বসাতে সে সরে গেল।

কিন্তু এই তো একটা জলজ্যান্ত নাটক আমার পাশে বসে আছে। একে একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয় না ! মুখে তো বেশ একটু ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-গোঁফের চাষবাস চালাচ্ছে। ইনটেলেকচ্যুয়াল সাজতে চায় বোধ হয়। তা হোক, সোহোর পর্দা তুলে ধরবে নিশ্চয়ই আমার জন্যে। গিন্নীর অর্ডারের কথা মনে করে একটু সাহস পেলাম।

'একসকিউজ মি' বলে ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম। নতুন এদেশে এসেছি, আমারি দেশের লোক যখন, একটু সাহায্য করলে, এদেশের গোপন হৃদয়টুকুর

পথ দেখালে অনেক কৃতজ্ঞ হব, ইত্যাদি মামুলী গৎ ঝেরে গেলাম। ছোকরা এবার তাজা চায়ের অর্ডার দিল।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে দু জনে সোহোর রাস্তা দিয়ে চলেছি। পঁয়ত্রিশ আর পঞ্চান্নতে বেশ ভাব হয়ে গেছে—ওর গলায় রেশমী রুমাল আর আমার পট্টুর কমফর্টারের তফাৎ সত্ত্বেও। সিনৃহা আমায় তার সোহোর ক্লাবে নেমন্তন্ন করেছে। পর্দা তুলে বোহেমিয়ার মনের ছবি দেখাবে।

আরও আধ ঘণ্টা পরে সিনৃহা কিন্তু একটু রঙিন হয়ে উঠল। ওর ক্লাবটার আবহাওয়াতে এমনিতেই বেশ একটা আমেজ আছে। রাস্তা থেকেই মাটির নীচে 'বেসমেণ্টে' নেমে যাবার সিঁড়ি; কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট পর্যন্ত নেই। ওপরে পাকিয়ে পাকিয়ে ব্রোঞ্জের অক্ষরে নাম লেখা—দি কেভ। গুহাই বটে। সরু দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকেই একটি 'বার' অর্থাৎ মদের কারবার। সামনের কাউণ্টারটা কাঠের নয়, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী। আমাদের দেশের ঢেউ-টিনের মত ঢেউ-তোলা ভাব দেখে বেশ মজা লাগল। ঘরের দেওয়ালে ওয়াল-পেপারের বদলে এবড়ো-খেবড়ো কাঠের এলোমেলো প্যানেল। বসবার চেয়ারগুলোর সিট হরেক রকমের রঙিন রশির আর টেবিলগুলো সিঙ্গাপুরী বেতের। বাতিগুলো বিজলীর কি মোমের বোঝাই যায় না। মোট কথা, ওগুলো বাল্‌ব হলেও মোমবাতির চেহারা; তা-ও লাল ঘোমটায় ঢাকা।

পঞ্চান্ন থেকে এক ধাক্কায় কুড়িটা বছর খসিয়ে ফেললাম।

সিনৃহা শুধু 'ওয়াইন' খায়, 'লিকার' খায় না। অর্থাৎ পান করে, কিন্তু নেশা করে না। কেন? যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে স্কচ-হুইস্কির সন্ধান করতে গিয়ে জার্মানদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিল এক বার। সেই থেকে দিব্যি গেলে লিকার ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য নিজেই একটু হেসে টিপ্পনী কাটল—ফরাসী সুরার রসের পরে কি আর হুইস্কি জিভে লাগে?

আমি নিজে অবশ্য ও দু'টি রসেই বঞ্চিত। একটু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলাম,—মিথ্যে বলছেন না তো?

হো-হো করে অট্টহাসিতে সে ফেটে পড়ল। বলল,—মিথ্যে কথা? মাই ফুট! অবশ্য মিথ্যে কথা শুধু আমার মত ইনটেলেকচুয়ালদেরই বলবার অধিকার আছে।

ভ্যাঁ রুজ অর্থাৎ ফরাসী লাল মদে আরেকটা চুমুক দিয়ে সে বলল,—আছে আপনার হিম্মৎ মিথ্যের বেসাতী করবার ?

আমি অবশ্য আর ঘাবড়াই না এসব প্রশ্নে। শুধু বললাম—স্বর্গ-নরক এ সব তো আছে !

হ্যাঁ, আছে হয়তো। কিন্তু স্বর্গ হচ্ছে দেবতাতে ভর্তি। আমি একটু নিরিবিলি জায়গা চাই।

গলায় বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সুর এনে শুধোলাম,—তা হলে নরক ?

মুখ থেকে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল—নোঃ। ওটা বড্ড প্রলেটারিয়াট। আমি হচ্ছি এক জন ইনটেলেকচ্যুয়াল।

ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—ঠিক এই জায়গাটাই তাহলে আইডিয়াল, কি বলেন ?

এদিকে আমার নজর ততক্ষণে তেরছা হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। একটি ছিমছাম তরুণী এসে ঘরে ঢুকল। কাঁচা-ডাঁসা পেয়ারার মত। তার চারদিকে চট করে মৌচাক গড়ে গেল।

সিনৃহার মুখে কিছুই আটকায় না। চট করে বলে বসল,—কি দেখছেন ? মেয়েটার দেহের সরল রেখাগুলো ফিগারে পরিণত হয়েছে কিনা তাই দেখছেন তো ?

লজ্জা পেয়ে গেলাম। এই বয়সে···থাক, ওসব রস-কষে আমার মতি নেই। শুধু নেহাৎ গিন্নীর খেয়াল মেটাতেই না এখানে এসেছি। তবু বললাম, ওর বয়স আর মনের কথা কোনটাই তো লুকোনো নেই।

ওয়াইন-গ্লাসটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে সিনৃহা হাসল,—তা দেখুন, বয়স লেখা থাকে দেহে, আর মনের কথা ছাপা থাকে চোখে। বেচারা কি করে ও দুটো লুকোবে বলুন ?

বলেই তার ফ্রেঞ্চকাট মুখটা আমার দিকে অনেকটা এগিয়ে দিল। বড় কেমন কেমন লাগতে লাগল। বেসামাল হয়ে পড়ে নি তো ? ওর ওয়াইনগুলো আবার "অন মি" চলছে। অর্থাৎ মদের দক্ষিণা আমিই গুণছি।

—কিন্তু, কিন্তু,—খুব চাপা গলায় ফিস-ফিস করে সিনৃহা বলল,—

কিন্তু, কিন্তু আমার সব কিছু লুকানো হয়ে গেছে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।

ওর গলার সুরটা যেন একটু-একটু ভেজা। আজকাল ইউরোপে যে কথাটা সবচেয়ে বেশী লোকের মুখে মুখে আলোচনা হচ্ছে, তার নাম একজিস্টেন্‌সিয়ালিজম অর্থাৎ বেঁচে থাকা। মানে, থোড়-বড়ি-খাড়া খেয়ে দেহরক্ষা নয়; সব কিছু দায়িত্ব এড়িয়ে গায়ে দিব্যি ফুর্তির হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো। যত অকাণ্ড-কুকাণ্ডের সাফাই গাইবার জন্য সুবিধামাফিক দর্শনতত্ত্ব। মোট কথা জীবনটাকে বেশ একটা মৌতাতী আমেজে ভরে রাখা যায়। আদ্রে জিদ্‌, জ্যঁা পল সার্তর এদের সব দোহাই দিয়ে যা কিছু করা যায়। নিজেদের বেলেল্লাপনা ঢাকবার জন্য মন্ত্রগুরুর অভাব নেই।

ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক বুঝি না! আর বুঝতে পারার মোকাই বা পেলাম কোথায় আমাদের এই সচ্চরিত্র দেশে?

তাই একে একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। বললাম, বেশ ঘনিষ্ঠ সুরেই বললাম,—কেন? আপনি নিশ্চয়ই একজিস্‌টেন্‌সিয়াল জীবনের রসটুকু পেয়েছেন!

গলার রুমালটা নাড়তে নাড়তে সে বলল,—রস? রসেই তো আমি ভরপুর থাকতে চাই। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন যে লোকে বুড়ো হয় নিজের বয়স দিয়ে নয়, স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

আহা! সে তো বড় দুঃখের কথা। আপনার স্ত্রী বুঝি—

না-না, আমাকে এখনও স্ত্রীর সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি। কিন্তু এবার রেহাই নেই। আমার পিতৃদেব এর পরের হপ্তাতেই এদেশে হাজির হচ্ছেন। নোটিশ দিয়েছেন যে সঙ্গে করে পাকড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং নিজের পছন্দ-করা একটি সুশীল সুবোধ বালিকার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবেন।

সে কি কথা? আপনার তো বয়স কম হয় নি! বাবাকে বুঝিয়ে লিখলেই পারেন।

তা কসুর করি নি। কিন্তু এত বছর পরে মনে হচ্ছে যে আর বাবা-মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

আমিও একটু ভেতরে ভেতরে জমে উঠেছিলাম। হেসে বললাম,—তা এই বেলাতে সবাই তো সুবোধ-সুশীল বালক সেজে যায়! আর তাতে সুবিধেও খুব।

তা ছাড়া আপনার স্ত্রী বোধ হয় দেখতে সুন্দরী হবেন !

সিনৃহা উল্লসিত হল না। বরং উল্টো। বলল—জোর করে গছিয়ে দেওয়া স্ত্রী যে কত দুঃখের ব্যাপার, তা আপনারা বুঝবেন না ! সেই দুঃখের জন্য আমার মনে ভয়ানক দাগ কেটে গেছে।

ওঃ। তা দেখুন, মদ নাকি খুব ভাল করে দাগ উঠিয়ে দেয়। পেট্রলের চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে দেয়।

বুঝলাম এর মনে একটা বিশেষ ঝড় চলেছে। সেটা বুঝতে হবে। তাই নিজে উঠে গিয়ে 'বার' থেকে আরও এক গ্লাস মদ নিয়ে এলাম ওর জন্য। বুকে আমার দুঃসাহস কম গজায় নি।

ততক্ষণে ওর মনে জোয়ার এসে গেছে। মুখে ফুটেছে কথা। ১৯৪৩ সন থেকে যখন ফ্রান্সে স্বদেশ-প্রেমিকার দল লুকিয়ে-চুরিয়ে হিটলারের সৈন্যদের উপর হামলা করতে সুরু করল, তাদের সারা পৃথিবী হাততালি দিয়ে প্রশংসা করতে লাগল। বিলেতেও অনেক ছোকরা ওই রকম বে-পরোয়া বাহাদুরি করে হাততালি পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। জীবনটা যখন খোলামকুচি, ওটাকে অমন করেই ব্যবহার করলে লোকসান কি ?

সিনৃহাও একটা ডিঙ্গি নৌকোয় মাইল চল্লিশেক সমুদ্র পেরিয়ে লুকিয়ে ফ্রান্সে কোন আঘাটায় গিয়ে উঠল। সেখান থেকে গেঁয়ো চাষী সেজে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন জংলা জায়গায় "মাকি" (maquis)-দের দলে ঢোকার কাহিনীর মধ্যে এক ফোঁটাও ভেজাল নেই। এখনও ওর সারা গায়ে তার বহু চিহ্ন, মনে অনেক ঝড়।

ছেলে-মেয়ে,বুড়ো-বুড়ী অনেক রকম লোকই 'মাকি'দের দলে ছিল। পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে, গাছের গুড়ির তলায়, আঙুর লতার আড়ালে, কত জায়গাতেই না ওঁদের লুকিয়ে থাকতে হত দিনের পর দিন। ম্যাঞ্চেস্টারে বয়নশিল্পের ছাত্র, বাংলা দেশের বড় ঘরের ছেলে, বাইশ বছরের সিংহের অদৃষ্টে কি অঘটনই না বুনে দিল এই যুদ্ধ।

আমাদের দেশের ভাল ঘরের ছেলে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য উঁচু নজর আর পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে। কিন্তু যাদের জীবনের কোন দাম নেই, তাদের মনেরও

নেই বাঁধন। হয়তো আজই নাৎসীদের গুলিতে ডেড মাটন (মরা পাঁঠা) হয়ে যাব, হয়তো হাতের কাছের গাছটা থেকেই লাস হয়ে ঝুলতে থাকব। তার চেয়ে ভীষণ কথা—হয়তো কোন বোমা বা গ্রিনেডের ঘায়ে আধখানা শরীর উড়ে যাবে ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত। এমন অবস্থায় বাঁচা-মরা সাধু-অসৎ সব কিছুরই মানে বদলিয়ে যায়। চোখের সামনে কত মৃত্যু, মৃত্যুর চেয়ে বেশী কষ্টে প্রাণটুকু নিয়ে টিকে থাকা এসব ঘটতে লাগল। মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'মাকি'রা অমৃত আস্বাদ করল।

শুধু অমৃত নয়, অমৃতের মত মধুর জীবনের বিষও। অনেকের চরিত্রের বাঁধনও গেল আল্‌গা হয়ে। এমনিতে ইয়োরোপে চরিত্রের মানদণ্ড আলাদা। তার ওপর সমাজের বালাই যেখানে নেই, সেখানে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেই বা কে? সিন্‌হা তার চার পাশের মরণ-পণ করা ছেলে-মেয়েদের জীবনের এই দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে গেল। বে-সামরিক বাঙ্গালী জীবনে মৃত্যু, না হয় মহিমা—এই তার ধ্রুবতারা।

এক দিন সমস্ত তল্লাটটা নাৎসী সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলল। গ্রামগুলিকে কড়া ভাবে বাছাই করতে লাগল—যেন ছাঁকনি দিয়ে দুধ ছাঁকা হচ্ছে। জার্মানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে এমন সন্দেহ করলেই সরের মত তাদের তুলে নেবে আর ছারপোকার মত টিপে মেরে ফেলবে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জায়গা নেই। সেখানে আবার খেতে দিতে হয়। তার চেয়ে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিলে, নিঃখরচায় যে শুধু মরে তা নয়, সেই লাসটা দিয়ে আর সবাইকে শিক্ষাও দেওয়া হয়। দলে দলে লোক জার্মান-জালে ধরা পড়ে মরতে লাগল। কিন্তু আসল যোদ্ধারা তো সবাই পাহাড়ে-জঙ্গলে।

মাকিরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাই একমাত্র উপায় হল একটা ডাইভার্সন করা অর্থাৎ অন্য কোন দিকে এমন একটা কিছু করা যাতে নাৎসীরা এই তল্লাট ছেড়ে অন্য দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়। অতএব কয়েক মাইল দূরে একটা সাঁকো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু ফিউজ তার নেই। এবং সাঁকোতে আছে পাহারা। অতএব যারা যাবে তারা আর ফিরবে না। এদিকে সবাই যেতে তৈরী। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মরবার অধিকার নিয়ে।

লটারী করে নাম উঠল সিন্‌হা আর জিনের! জিন খুব সাহসী আর কাজের

মেয়ে, কিন্তু চেহারাটিতে তার সৃষ্টিকর্তার হৃদয়হীনতা বড় বেশী ফুটে উঠেছে। এই এত দিনে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। সেও নিজের অবস্থা বুঝেই হোক আর রক্ষণশীল ফরাসী-পরিবারের মেয়ে বলেই হোক, কোন রকম যৌবন-চঞ্চলতার ধার-কাছ দিয়েও যায় নি। এখন অভিসারে চলল একজন যুবক আর একজন যুবতী! পরস্পরের সঙ্গে নয়; মৃত্যুর সঙ্গে।

শেষ রাতের অন্ধকারে সাঁকোর উপর যেতে হবে। ওরা সন্ধ্যা থেকে একটা খড়ের গাদায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। একটুখানি ফাঁক করে ঢুকে সেখানে দু জনে—প্রায় সারা রাত গায়ে গায়ে লেপটে কাটাতে হবে এক সঙ্গে।

গভীর রাতে সিনুহা জিনের যৌবন-চঞ্চলতার উত্তাপ অনুভব করল। জিন তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। মুখে নেই ভাষা, কিন্তু সারা দেহে তার প্রকাশ। সারা রাত্রি ভরা সে বাণীতে।

সিনুহা বাধা দিল,—জিন, জিন, ছিঃ। আমাদের সামনে কর্তব্য আছে। মোটে মিনিট চল্লিশেক বাকী।

তার নীরব উত্তর জিন দিল মুখ দিয়ে।

না, না, জিন! দূরে সরে যাও, সরে যাও অনুগ্রহ করে। আজ একটুও অন্য দিকে মন গেলে কর্তব্য নষ্ট হতে পারে। ভেবে দেখ, তোমার দেশ।

তার উত্তরে জিন মুখ দিয়ে কি যে অস্ফুট আওয়াজ করল তা বোঝা গেল না। কিন্তু সে যে বারণ মানছে না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

জিন, সিল্ ভুপ্লে, যদি অনুগ্রহ করে সামনের কাজটার দিকে পুরো মন দাও। এখন অন্য কিছু ভাবা যায় না। জিন, জিন, তোমার···

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জিন পাগলিনী বাঘিনীর মত রুখে উঠল,—কি? আমার কি? আমার চেহারা পছন্দ হয় না, এই তো?

বেঁচে গেল সিনুহা। জিনের রাগের সুবিধা নিয়ে সে বললে,—হ্যাঁ, তোমার চেহারাখানা ভেবে দেখ একবার। মুখটা তোবড়ানো, দুটো চোখের রং দু রকম, নাকটা রিভলভার ছুঁড়বার জন্য এগিয়ে তেড়ে আসছে।

জিন সত্যি সত্যি এবার ক্ষেপে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। ওর রিভলভারটা, নাকের নয়, হাতের রিভলভারটা যেন সিনুহার গায়ের উপর

কোথায় সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। সিন্‌হা এবার তার শেষ অস্ত্র বের করল নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

জানো জিন, তোমায় যখনি দেখি, তোমার চেহারাটা মনে হয় মডার্ণ ফরাসী আর্টের সেরা নমুনা। ঠিক যেন পিকাসোর আঁকা। হো, হো, হো।

বারণে যা হয় নি, দেশের দোহাইয়ে যা হয় নি, এই বিদ্রূপে তা হঠাৎ হয়ে গেল। জিন, বেচারী কুরূপা জিন, দু হাতে মুখ বুজে খড়ের গাদার মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আওয়াজ হলে বিপদ, খড়ে নাড়াচাড়া পড়লে বিপদ। সব দিক দিয়ে নিরুদ্ধ রোদনের সে কি বেদনা!

কিন্তু জিনকে এরকমভাবে কেঁদে সারা হয়ে যেতে দিলে চলবে না। ওর মনকে শক্ত করিয়ে নিতে হবে। সামনে নিষ্ঠুর কর্তব্য। হয় মৃত্যু—না হয় মহিমা।

সিন্‌হা ভেবে-চিন্তে ঠিক করল যে জিনের সঙ্গে এ ব্যাপারটা আলোচনা করেই ওকে শান্ত করতে হবে,। তাই তাকে বুঝিয়ে বলল,—ভেবে দেখ জিন, আমি ইণ্ডিয়ার লোক, হিন্দু। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক সম্বন্ধ আমাদের কাছে পাপ। আমাদের দেশে বাপ-মা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে দেয়। ভাবী স্বামী-স্ত্রী বড় জোর বিয়ের আগে পরস্পরকে একটু দেখে নিল! কিন্তু কোন দৈহিক সম্বন্ধ নেই। ভেবে দেখ, আমি কি তোমার অসম্মান করতে পারি!

জিন অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল,—সে কি সাংঘাতিক কথা! চেনা নেই, শোনা নেই, বাপ-মা নিজেদের পছন্দ মত বর-কনে ঠিক করে দিলেই তাদের মধ্যে সম্পর্কে পাপ নেই? দেহ কি জামা-কাপড়ের মত বাইরের জিনিস যে অন্য লোকের ইচ্ছা মত, পছন্দ মত অচেনা কাউকে দিয়ে ফেলা যায়? আমি তো ভেবেই পাই না তা কি করে সম্ভব? প্রায় অচেনা-অজানা একজন স্ত্রী কিংবা পুরুষের সঙ্গে থাকাটাই পাপ? কি ঘেন্না, কি নোংরামির কথা! মা-গো!

সিন্‌হা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। ধর্মের বন্ধন, হিন্দু বিয়ের মূল-তত্ত্ব সব কিছুই বলল। অবশ্য, পতিদেবতা তত্ত্বের কথাটা তুলবার সাহস হল না।

কিন্তু কোন কথাই জিনের মনে ধরল না।

জিন শুধু বলল,—না, না, সে বড় লজ্জা, ঘোর অসম্মানের কথা। আমি তো ভেবেই পাই না, তোমাদের দেশের মেয়েরা কেমন করে এরকমভাবে আত্মসমর্পণ করে?

কেন? স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণে তো কোন দোষ তুমি নিজেই দেখছ না!

স্বেচ্ছা কোথায় দেখছ তোমাদের দেশের ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে? ওটা তো বাপ-মায়ের ইচ্ছা!

সিন্‌হা হেসে ফেলল। বলল,—সে কথা না হয় দেশে ফিরে গিয়ে ভেবে দেখব। কিন্তু এই যে তোমাদের দেশে বিয়ের বাইরেই এত সব অশাস্ত্রীয় কাণ্ড হয়—

খুব গভীর স্বরে জিন বলল,—অশাস্ত্রীয় মোটেই নয়। অসম্মানজনক তো নয়ই। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, নিজের বিবেচনা বিবেক সব-কিছুর সমর্থন নিয়ে। যাকে এত দিন ধরে চিনলাম, জানলাম, মন দেওয়া-নেওয়া করলাম, তাকে আর অদেয় কি থাকতে পারে? যাকে চেনো না, জানো না, ভালবাস না, তাকে হয় দাও ভিক্ষা, না হয় আদায় কর জোর করে। ছিঃ, আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন সমাজের ছেলে-মেয়েরা সে কথা ভাবতেই পারি না! এই যে, মনে কর তোমাকে এত দিন ধরে চিনলাম জানলাম···

সিন্‌হা আর কথা বাড়াতে দিল না। সময় হয়ে এসেছে। সাঁকোতে পৌঁছানোর সময় হয়ে এল। ওদের পায়ের তলায় মৃত্যু, মাথার উপরে স্বর্গ।

*

* *

জিন সেই স্বর্গে চলে গেছে। তার জীবনের শেষ সাধ, শ্রেষ্ঠ সার্থকতা আমি পূর্ণ করতে পারি নি। কিন্তু এক সঙ্গে থাকার শেষ মুহূর্তটির প্রেমের চিহ্ন আমার সর্বাঙ্গে বহন করছি। একটা শ্রাপনেল বোমা ফেটে একই আঘাতে জিনকে মেরে গেল, আর আমাকে সেই মহিমার আজীবন সাক্ষী রেখে গেল। সেই অমর মুহূর্তে এক ফোঁটা জল দিতে পারি নি তার মুখে; শুধু দিয়েছি আমার শেষ চোখের জল আর আমার প্রথম চুম্বন।

এর পর সিন্‌হা চুপ করে রইল। আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। যেন

আমায় নিরুপায় পেয়ে সে তার এই কাহিনীটার ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে গল্পের ভার এই বিবাহাতীত দেহ সম্বন্ধের তত্ত্ব আমার কাছে বড় ভারী হয়ে উঠেছে। আজ রাতে গৃহিনীর কাছে সোহোর বর্ণনা লিখতে বসে যদি প্রেমের এই দর্শন ব্যাখ্যা করতে যাই তার উল্টো উৎপত্তি হতে পারে। নাঃ—এই বাউণ্ডুলে মাতালের আড্ডা বোহেমিয়া থেকে আস্তে আস্তে কেটে পড়াই ভাল। কিন্তু একটা যুৎসই অজুহাত দেখাতে হবে তো!

তার দরকার হল না। এর মধ্যেই সিন্‌হা নিজের মনের ভার ঝেড়ে ফেলেছে। হয়তো ঢেকে ফেলেছে—তা-ও হতে পারে। পাশের কামরা থেকে জ্যাজ বাজনার সঙ্গে গান ভেসে আসছে। তার তালে তালে সে আঙ্গুল ঠুকছে টেবিলে :

'ভোর ইস্তক বাঁচার মেয়াদ,
নাচবে না সখি?
দু'দিক থেকে জ্বালাও মোম,
ঢেলো না ছাইয়ে ঘি।'

বসে বসে আমিও আগুনে ঘি ঢালা দেখতে লাগলাম।

অভিনয় নয়

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখছে। ওরা দুজনে তন্ময় হয়ে পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখছে। তন্ময়ও বটে, পাশাপাশিও বটে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তন্ময় নয়।

বরং জীবনে কোনদিন নিজস্ব নয়, কিন্তু নিজের করে আনা বন্ধু বা বান্ধবী, অথবা প্রিয় বা প্রেয়সীর সঙ্গে লুকিয়ে যারা সিনেমা-থিয়েটারের অন্ধকারের আশ্রয়ে ক্ষণিকের প্রেমের ছোঁয়া পায়, তারা এক নজরেই বলে দিতে পারবে যে, ওরা শুধুই পাশাপাশি বসে আছে। নেহাৎ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ চেয়ারগুলি পিঠোপিঠি না সাজিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে বলে।

অর্থাৎ যে মন নিয়ে শুক আর সারি এক দাঁড়ের উপর পাশাপাশি এসে বসে, সে মন নিয়ে এরা আসে নি।

এমন কি, বিরহ-নদীর দু পারে থেকেও চখাচখী (সমাজবাদীরা নাকি এদের নতুন নামকরণ করেছেন—'সখাসখী') যেভাবে সারা রাত ধরে পুনর্মিলনের জন্য ব্যাকুল থাকে, সেরকম ভিতরে ভিতরে উন্মুখ ভাবও এদের মধ্যে নেই।

সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নিরাসক্ত পরস্পরের প্রতি। অথচ চোখ, মন ও সর্ব ইন্দ্রিয় যেন মঞ্চের মায়ায় এক হয়ে অভিনয় দেখে যাচ্ছে। যাতে মন বা চোখ বা হাতখানাও ভুলেও পাশের জনের দিকে না চলে যায়।

অথচ অভিনয় হচ্ছে রোমিও ও জুলিয়েট।

এবং অভিনয় দেখছে বিকাশ ও বল্লরী।

বিকাশ সরবরাহ-দপ্তরের একজন হালের ছোকরা-অফিসার। যুদ্ধের বাজারটা এখনও বেশ গরম রয়েছে। কাজেই চাকরির বাজারটাও ভালই চলছে। আর বেঁচে থাকুক সরবরাহ-দপ্তর। তার কল্যাণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে অনেকে। এবং আরও অনেক দূর এগোবার আশা রাখে অনেকেই।

তবে বিকাশ তেমনভাবে এগোবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে না। বহু কালো-বাজারীর চকচকে নগদ টাকা বা ঢাকা-দেওয়া প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে সে ওই সব হতাশ প্রেমিকদের কাছ থেকে 'পাতি অফিসার' (পেটি অফিসার নাম)

পেয়েছে পিছনে পিছনে। অবশেষে তার মাথার উপর অনুকম্পার বিষ-নজর ঢেলে ওই সব হতাশ প্রেমিকরা অন্যত্র গিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নিয়েছে, এটা বুঝতে পারার দুর্ভাগ্যও তার হয়েছে। কিন্তু সে টলে নি কিছুতেই। সদ্য পিছনে-ফেলে-আসা কলেজ-জীবনে পড়া সেক্সপীয়রের বাণী মনে মনে আউড়ে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে। যে তার টাকা চুরি করবে, সে পাবে টাকা না ছাই। কিন্তু তার সুনাম যদি কেউ চুরি করতে পারে, তাহলে তো সবই গেল।

বুদ্ধিমানরা বিভোর হাসি হেসে অনুকম্পার স্বরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, ছোকরার এখনও অনেক শেখাই বাকী আছে।

এই অভিনয়েও সে আসত না। কিন্তু যুদ্ধের বাজারের আর সরকারী কাজের চাপে জীবন থেকে সব রসকষ শুকিয়ে গেছে। তাই যখন কয়েকজন ভাবী অনুগ্রহপ্রার্থী এই বিলেত থেকে আসা শখের দলের অভিনয় দেখে যেতে ধরল, তখন তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হতে হল শেষ পর্যন্ত। ভেবে দেখল, এমন আর কি দোষ হবে এতে? টাকা-পয়সা নয়, সাংসারিক সুযোগ-সুবিধা নয়, এমন কি একটা দামী উপহারও নয়, মাত্র একটা কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট স্বামী-স্ত্রীর জন্য।

শেষ পর্যন্ত সে নিল, কিন্তু যে দিচ্ছে—তার জন্য নয়; নিমন্ত্রণের পিছনে কান টানলে মাথা আসার সম্ভাবনায় নয়, শুধু সেক্সপীয়রের জন্য, আর ওই খাস বিলাতী অভিনয়ের জন্য।

এতে নিশ্চয়ই তার সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ সাধু চরিত্রে কোন কলঙ্কস্পর্শ হবে না। অথবা হবে না কোন কানাঘুষা।

তবু মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল,—যতক্ষণ না অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। তার পর যখন বইয়ের পাতার সুপরিচিত দৃশ্য একটার পর একটা সামনে এসে পড়তে লাগল, তখন সে এসব কথা ভুলে গেল। কিন্তু একটা কারণে এখন মনটা আরও বেশী খচখচ করছে। সেই ব্যাপারটার উপর রঙ্গমঞ্চের যবনিকা এখন একটু একটু করে উঠতে লাগল। একদিনের ব্যাপার নয়, একটা মামলার হিসাব নয়, বহু দিন ধরে, বহু বিষয়ের মধ্যে একটা বেসুরো রেশের ব্যাপার।

মানসের মঞ্চে তাদের ছায়ামূর্তিগুলো একে একে চরে বেড়াতে লাগল—পাদ-প্রদীপের আলোয় তাদের বিস্বাদ বিবর্ণ ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে।

এই গতকাল সন্ধ্যাবেলার কথাটাই ধরা যাক না। অফিস থেকে তখন সে সবে ফিরেছে। মনের মধ্যে তখনও একটা সামান্য দ্বন্দ্ব চলছে যে, টিকিটটি নেওয়া ঠিক হবে, কি হবে না! যারা দিতে চাইছে, তাদের অফিসের সঙ্গে সরবরাহ-যোগানোর সম্পর্ক আছে। যদি ও টিকিট নেয়, তার সুযোগ নিয়ে তারা ওর কাছে এগিয়ে আসবে। অন্ততঃ মতলববাজী করে রটিয়ে দেবে যে সেও আজকাল তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে থাকে। ওর নিজের শিক্ষা ও প্রবৃত্তি সেটুকু সম্বন্ধও সৃষ্টি করতে দিতে প্রস্তুত নয়। হোক না তার চারদিকে অন্য মানদণ্ডের অনেক লোক, সে তো নিজের মানদণ্ড ঠিক রেখেছে। হোক না সে তাদের তুলনায় নিঃস্ব—নিঃশেষ তো নয়।

মনে দ্বিধা সংশয়ের দোলা নিয়ে সে বাড়ি পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু বল্লরীর মনে তো তার কোন ঢেউ গিয়ে পৌঁছায় নি। সে বেচারী তো কিছু না জেনেই সহজভাবে তার কাছে বাড়ি পৌঁছানো মাত্র কোন সিনেমা বা থিয়েটারে যাবার প্রস্তাব করেছিল। বলেছিল যে, প্রত্যহের র‍্যাশন, হিসাব আর নিষ্প্রদীপের জ্বালার হাত থেকে একটুখানি বিরতি, একটুখানি নিষ্কৃতি দরকার। সংসারের ঘানিতে একটু সরষে না ঢাললে আর তাতে তেল পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রস্তাবটি শুধু সঙ্গত নয়, সংযতও বটে। বল্লরী তো বলে নি, ফার্পো বা গ্রেট ইষ্টার্ণে খানা-পিনায় মাসের অর্ধেক মাইনে উড়িয়ে দিয়ে আসতে অথবা ব্যারাকপুরের ঘোড়দৌড়ে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করে আসতে। সে বেচারী তো জানতও না যে, বিকাশের মনে এই একটু আমোদ-আহ্লাদের কথা নিয়েই তখন দ্বন্দ্ব চলছিল। তবে কেন সে হঠাৎ খুব স্বাভাবিক ও সামান্য একটা নিরীহ কথাতেই সাপের গায়ে পা পড়ার মত ফোঁস করে উঠল?

কোথায় গেল তখন তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা, অনুশীলিত মনের আভিজাত্য?

কেন? বিকাশের স্ত্রী বলে কি বল্লরীর বেলায় নীতি ও রুচির কোনটি দেখানোরই প্রয়োজন নেই? কৈ, রাস্তায় চেনা কোন বিপুল বা বিপ্রচরণ বা বিরূপাক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার সে করতে পারত?

এই মাত্র জুলিয়েট কি গভীর দরদ দিয়ে, আবেগভরা কণ্ঠে, আবেগমাখা মুখে বলে গেল:

'এস ভদ্রা রাত্রি
তুমি শান্তবেশা ধাত্রী, সর্বাঙ্গ নিকষা।

*
* *

এস রাত্রি, এস রোমিও,
এস রাত্রিমাঝে দিবা।'

রোমিওর প্রতি আকুল আহ্বান, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিনের মত উজ্জ্বল রোমিওর আবাহন—এ কি শুধু একা জুলিয়েটের মনের কথা? ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার জুলিয়েটরা কি সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু আঁকতে আঁকতে, মাথার চুলে পরিপাটি করে কবরী বাঁধতে বাঁধতে নীরব ভাষায় অথচ নিবিড়ভাবে এই জুলিয়েটেরই কথার পুনরাবৃত্তি করে না?

বল্লরী অন্তত করে।

এবং যারা বল্লরীর মত কলেজে পড়ে, শহরে ঘোরাফেরা করে, পাঁচজনের সঙ্গে মেশে ও দশজন কবির কাব্যগ্রন্থ মুখস্থ করে আধুনিকা হয়ে ওঠে নি, তারাও করে।

তবে?

বিয়ের পরে প্রথম যখন বল্লরী বাপের-বাড়ি ফিরে গেল, অফিসের ছুটি ছিল না বলে বিকাশ জোড়ে একসঙ্গে ফিরে যেতে পারে নি শ্বশুরবাড়িতে। সে রাত্রিটিতে বল্লরী একেবারে জুলিয়েটের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছিল। নব প্রেমের নব আশার উল্লাসে, কল উচ্ছ্বাসে সে বলেছিল ঃ

'বিদায়, হে মধুময়,
বসন্তের বিকাশ-চুম্বনে এ প্রেমকোরক
পুনর্দর্শনকালে সুন্দর ফুল ফুটে উঠবে।'

সেক্সপীয়র-পড়া নববধূর বাক্‌চাতুর্যে, রসবিদগ্ধতায় প্রেমাবিষ্ট বিকাশ সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল যে, এই প্রেম, এই নিবিড় আনন্দ-রসঘন প্রেম তাদের দু-জনের জীবনে সব কিছুই মধুর করে তুলবে। ভরে

দেবে অভাবকে অনুভব দিয়ে। ঢেকে দেবে মর্তের দুঃখকে স্বর্গের সুখ দিয়ে। শ্যামল সরস করে তুলবে এই ধূলিরুক্ষ সংসারকে।

এ তো বিবাহ নয় শুধু, এ আবহমানকাল ধরে আরাধনা-করা স্বর্গের আবাহন।

তবে কাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বল্লরীর খুব স্বাভাবিক একটা প্রস্তাবে কেন সে হঠাৎ জলে উঠল ?

শুধু তো কালকের কথাই নয়, অনেকদিন থেকেই এরকমভাবে খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা একটু বেসুরো, একটু বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসের মধ্যে কোথায় যেন একটা কালসাপের ঘুমন্ত নিঃশ্বাস শোনা যায়।

মনে মনে নিজেকে যাচাই করে নিতে লাগল বিকাশ।

ঠিকই তো, তার নিজেরই দোষ। সে নিজেই খুব অনুযোগ করেছিল যে, বল্লরী তাকে আর আগেকার মত ভাল চোখে দেখে না। তার প্রতি কোন সহানুভূতি নেই, নেই তার পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা অন্য কোন প্রয়োজনের প্রতি নজর। না হলে তেতে-পুড়ে অফিস থেকে ফেরার পরই এসব অন্যায় আবদার কেউ করে ? যে আবদারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাসের শেষের সংসারের নানারকম খরচ-চালানোর অসুবিধা, অফিসের নানারকম ফাইল ও স্টেটমেণ্ট কোনমতে শেষ করার হাঙ্গাম, বড় সাহেবের চড়তি মেজাজের সঙ্গে বাড়তি পরিচয়। নাঃ, দুনিয়াটাই বেদরদী। কেউ তার নিজের কথাটুকু ছাড়া ভাবে না, এমন কি অফিস ফেরৎ স্বামীর শ্রান্তির কথাটুকুও না। বিড়বিড় করে নানারকম নতুন আর পুরোনো ভুলে-যাওয়া আর ভাবী অভিযোগ আওড়াতে আওড়াতে বিকাশ নিজেকে বাঁচাতে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরের দিন ভোরেও আগের সন্ধ্যার বেসুরো আবহাওয়াটা এলোমেলো-ভাবেই বইতে লাগল। ফিরল না শান্তির সুর, উড়ল না ক্ষান্তির শাদা পতাকা। সকাল থেকেই সাংসারিক খুঁটিনাটিতে একটা থমথমে ভাব জমাট হয়ে উঠতে লাগল।

অনেকদিন তার চুল-ছাঁটার সময় হয় নি। অফিস থেকে সোজা ছুটতে হয় বাড়িতে ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে। তাই সেলুনে যাওয়া ঘটে ওঠে না সহজে। আর এই ট্রামে-ঝোলা বা বাসে-দোলার যুগে সকালেও এমন কিছু বেশী সময় বা

সুবিধা হাতে থাকে না। প্রভাতের দোলা-জাগা বাতাসে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কোন সেলুনে চুল কেটে আসা তাই সম্ভব নয়। রবিবারগুলোও এত খারাপ—সপ্তাহে তো মাত্র একটা! তার উপর সেদিন নানা কাজ ও অকাজ এসে জোটে, নানা বন্ধুবান্ধব, সংসারের হরেকরকম অর্ডার। যাই হোক, চুল একটু বড় হয়ে উঠলে এমন আর কি অপরাধ হয় যে, তার জন্য বল্লরী তাকে অমন করে ঠাট্টা করে হাসতে থাকবে?

হ্যাঁ, সে স্বীকার করছে যে, ঘুম থেকে উঠবার সময় তার চুলগুলি শুধু যে এলোমেলো হয়ে সামনের দিকে নেমে এসেছিল তা নয়, কপালের উপর দিয়ে বটগাছের ঝুরির মত ছড়িয়ে এসে চোখ দুটো ঢেকে দিয়েছিল, নাক-মুখও আধঢাকা হয়ে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল সম্ভবত।

গেল রাতের মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কল্যাণে অনিদ্রার পর মোটে সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়েই সে বল্লরীর চোখে পড়ল। প্রভাতের প্রথম দেখায় ঘটল না সংস্কৃত কাব্যে লেখা কোন দৃষ্টি-মহোৎসব। বিকাশের মুখ একটা হাইয়ের কল্যাণে আরও বিসদৃশ হয়ে উঠল। এমন অস্বস্তিকর অবস্থা যে, হাত দিয়ে হাইটা ঢাকতেও সে ভুলে গেল।

বল্লরীর মুখ রৌদ্রে ঝলমল করা তরোয়ালের মত চঞ্চল হয়ে নেচে উঠল। গত রাত্রির মন কষাকষি সে ঝকমকে তরবারিতে আরও শান লাগিয়ে দিল। সে বলে উঠল: বাঃ, মুখখানা বেশ ভাল বানিয়েছ দেখছি! একেবারে বঙ্গোপসাগরের ডেলটা (ব-দ্বীপ) মনে হচ্ছে। আহা, গঙ্গার খাঁড়িগুলি রাশি রাশি নেমে আসছে খাস মহাদেবের জটা থেকে! শীগ্‌গির যাও, চেহারাটা ভদ্রস্থ করে নাও। লোকে দেখলে কি বলবে!

একটু থেমে বল্লরী আবার বলল: বিশ্বাস না হয়, আয়নায় মুখখানা একবার দেখে এস, আর বাংলা দেশের ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

বল্লরীর মুখের হাসি চিকণ ছুরির মত বার বার বিকাশকে যেন আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল।

বিব্রত হয়ে বিকাশ তাড়াতাড়ি দু হাতের দশটা আঙুলই চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল। যদি মাথার উপরে চুলগুলি একটু কম বেসামাল মালুম হয়।

কিন্তু বল্লরী সেখানেই থামল না। খরধার শ্লেষে আঘাত করে বলল: আজকাল বোধ হয় অফিসটি শখের যাত্রাদলের আড্ডা হয়ে উঠেছে। তাই ভেড়ার লোমের মত চুল গজালে কিছু বেখাপ্পা হয় না।

কাল রাত্রে সে যে এই বিলেতী শখের থিয়েটার দলের অভিনয়ে নেমন্তন্নের কথাটা বল্লরীকে বলে নি, সেজন্য বিকাশ নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

এক পা এগোতে না এগোতেই শুনতে পেল, পিছন থেকে বল্লরী বলছে: কি জানি, যুদ্ধের বাজারে পশমের ঘাটতি পড়েছে কিনা, তাই বোধ হয় আজকাল চুল চালান দিচ্ছ তোমরা বিলেতে! তা ভাল, এমন প্রভুভক্তি না হলে যুদ্ধ জিতবে কি করে তোমরা?

অভদ্র নয়, অশিক্ষিত নয়, রুচিহীন নয়। তাই এর চেয়ে বেশী খোলাখুলি আর কি করে মানুষের চেহারা নিয়ে আক্রমণ করা চলে! কিন্তু বিকাশ অবাক হয়ে গেল যে, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে বল্লরী কিনা এমন তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করল!

হায় প্রভাত, তুমি তো সুপ্রভাত নও! ওই যে রোমিও স্টেজে দাঁড়িয়ে প্রভাতের বর্ণনা দিচ্ছে:

'রাতের প্রদীপ পুড়ে হল সারা;
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে প্রভাত
দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে কুয়াশা-ঢাকা
গিরিচূড়ে।'

কৈ, রোমিও তো কত দুঃখের মধ্য দিয়ে কত দূরে চলে যাবে এখুনি। জীবনে আর কোনদিন জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানে না। মাথার উপরে ঝুলছে আদেশ জীবনহানির, পায়ের নীচে দুলছে আবাহন পলায়নের। সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রোমিও আর জুলিয়েট।

পিছনে শুধু একটিমাত্র রাতের মিলন ও সামনে হয়তো সারাজীবনব্যাপী বিরহ! এত আনন্দের অবসান ও এত বিষাদের আবির্ভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৈ ওরা তো অনুভব করছে না আক্ষেপের মধ্যে কোন আক্রোশ অথবা মনোভঙ্গের মধ্যে কোন মনোমালিন্য?

আজ সকাল বেলার দৃশ্যটা আবার বিকাশের মনে পড়ল। নিজেরই অজ্ঞাতসারে বোধ হয় মাথার চুলের উপর হাতটি গিয়ে উঠল একবার। চুল এখনও কাটা হয় নি, কিন্তু এলোমেলো হয়েও নেই মাথার উপর। শিবের জটাজাল থেকে গঙ্গার খাঁড়িও নেমে পড়ছে না। ঠিক যেমন সারা রাত্রির শেষে সদ্য শয্যা থেকে উঠে-আসা রোমিওর মাথার চুলে এলোমেলো নেই। ওর এই মোটামুটি পরিপাটি অবস্থা কি শুধু সাজঘরের পরিচালনার ফল? না রোমিওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক? রোমিও কি সব অবস্থাতেই নিজেকে জুলিয়েটের জন্য প্রস্তুত করে রাখে? প্রেমের কি এই নিয়ম?

ভাবতে ভাবতে বিকাশ কোথায় যেন চলে গেল। সত্যই তো, বিকাশ তো শুধু বিকাশ নয়, বল্লরীরও নয় শুধু বল্লরী। আবহমানকাল থেকে, এমন কি সেক্সপীয়র এই নাটক লেখার আগে থেকে, এমনভাবেই রোমিও আর জুলিয়েটরা সংসারের স্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে, দোলা দিতে দিতে—অনির্দিষ্ট অনির্দেশ্য কালসাগরে লোপ পেয়ে গিয়েছে। যাত্রাপথে এসেছে কত সংশয়, কত সংগ্রাম, কত হানাহানি, কত হাহাকার! তবু কি তারা কোনদিন পিছু ফিরে স্রোতের বিপরীত পথে বা কোন ঘাটে-আঘাটায় আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে? দিশেহারা হয়ে পরস্পরকে আঘাত দিয়েছে বিনা কারণে—বিনা করুণায়? রাজী হয়েছে কি সংসারের জুলিযেটরা অবাঞ্ছিতকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে? রোমিওরা বাঁধাধরা গতানুগতিক জীবনে আচ্ছন্ন হয়ে আত্মরক্ষা করতে? না, বাইরের সংঘাতের ফলে নিজেদের পরস্পরকে আঘাত করে দুঃখ পেয়েছে বা দুঃখ দিয়েছে?

না। না। নিজের মনেই বিকাশ বলে উঠল, না, না।

তবে?

তবে কেন সে এই রোজকার অসুবিধা, র‍্যাশন, বাসে-ঝোলা, মাসকাবারের হিসাব কষার মধ্যেই নিজেকে জুলিয়েটের জন্য প্রস্তুত করে রাখবে না? কেন সে একটি সন্ধ্যায় বল্লরীর চিত্ত বিনোদনের একান্ত ন্যায্য ও স্বাভাবিক দাবী শুনে বিমুখ হয়ে উঠল? কেনই বা সে আজ বল্লরীর দৃষ্টিতে প্রথম পড়বার সময় নিজেকে একটু কম এলোমেলো করে নিল না? সে কি শুধুই প্রত্যাশা করবে

বল্লরীর কাছে বরণডালা? নিজেকে কি করে রাখবে না তার কাছে অহরহ বরণীয়? প্রেম কি জীবনের প্রভাতের জন্যই?—তপ্ত মধ্যাহ্নে বা শ্রান্ত অপরাহ্ণে কি তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, না কমে যায়?

সাধারণ প্রত্যহের আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যেও সে তো রোমিওর মতই একটু শোভনতা, অন্তত একটু সহনীয়তা প্রত্যাশা করে। তাই তাকেও তার বল্লরীর কাছে নিজেকে একটু শোভন, একটু সহনীয় করে তুলতে হবে।

বল্লী!

কোন প্রিয় বন্ধুর মত পিছন থেকে নামটা যেন তার উপর একটু আলগোছে টোকা দিয়ে গেল। হঠাৎ, একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

অথবা যেন সুষুপ্ত স্মৃতির সরোবরে শীতের নিশীথে বসন্তের একটা মৃদু হিল্লোল হঠাৎ একটু ঢেউ জাগিয়ে গেল! টলমল করে দুলে উঠল মানস-শতদল! ঝলমল করে উঠল আকাশের বুকে শত শত অনিমেষ অতন্দ্র তারকা!

রোমিওর খবরের প্রত্যাশায় ব্যাকুল বুকে আকুল আবেশে জুলিয়েট একটু আগেই রাত্রিকে উদ্দেশ করে বলে গেছে যে, রোমিও যখন আর থাকবে না, তখন তাকে যেন টুকরো টুকরো তারায় ভাগ করে নেয় রাত্রি। রোমিও তখন আকাশের মুখখানা এত সুন্দর করে তুলবে যে, সমস্ত জগৎ রাত্রির সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাবে এবং খরসূর্যের উপাসনা আর করবে না।

নিজেকে অমন করেই আমি ছড়িয়ে দেব বল্লরীর আকাশে। তার প্রতি-দিনের সংসারের আকাশে। যাতে সঙ্গদানে, সেবায়, সহানুভূতিতে 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবে' সব খররৌদ্রের দাহ স্নিগ্ধ হয়ে যাবে, তারকার মৃদু হীরক-দীপ্তিতে। আজ থেকে সে হবে নতুন লোক। নতুনভাবে হবে তার বিকাশ।

কোথা দিয়ে যে অভিনয় শেষ হয়ে গেল, তা বিকাশ ঠিক খেয়াল রাখে নি। ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি ওরা দুজনে বেরিয়ে এল। স্রোতের তোড়ে একজোট হয়ে ভেসে-আসা শৈবালের মত। কিন্তু পথে বেরিয়ে এসেও ওরা খুব কাছাকাছি—পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। শান্ত রাত্রির নীরব নিষ্প্রদীপ পথে দুটি প্রাণী। কোন সাড়া নেই। নেই কোন ইশারা।

একটু পরে বল্লরীর একটি হাত সন্তর্পণে মিলে গেল বিকাশের হাতে। আরও একটু পরে বল্লরী মৌন ভেঙ্গে বলল : আমার খুব ভুল হয়েছে—গত ক'মাস থেকে। তুমি সে সব ভুলে যেও কাশ।

কাশ, কাশফুল, বিকাশ বসু নয়, প্রফুল্লকাশা বসুধা এসব কত অন্তরঙ্গ অনুরাগ সিক্ত নামে যে বল্লরী তাকে ডাকত, বিকাশ সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সে নামের একটুখানি ছোঁয়া লেগে যেন কাশফুলের শীষে শিশির বিন্দু টলমল করে উঠল।

সংস্কৃত-কবির প্রফুল্লকাশা বসুধা শুধু অধরোষ্ঠের একটু মৃদু কাঁপনের মধ্যে দিয়ে সাড়া দিল : বল্লী !

ওদের প্রত্যহের জীবনে নূতন উষা এসে উদিতা হবে এখন থেকে। রোমিও জুলিয়েটের ভেরোণা শহরে শুধু নয়, সারা সংসারে যে উষার আবাহন করে গেছে যুগে যুগে নবপ্রণয়ীর দল, যার আলোয় আকুল কণ্ঠে আমন্ত্রণ করেছে প্রিয়তমাদের, ব্যাকুল বাহু দিয়ে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে প্রেয়সীকে, বিহ্বল চঞ্চলতায় উপেক্ষা করে গিয়েছে বিপদকে—বিদ্বেষকে,—বিরোধকে। যে উষা কুযাশার অন্তরালে গিরিচূড়ায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে আলোয় ঝলমল করে তুলবার জন্য সকলেরই জীবনকে—আবহমানকাল থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত —অতন্দ্র, অনলস হয়ে।

বিকাশ আর বল্লরী সেই উষার অভিমুখে হেঁটে চলেছে অন্ধকার দীপহীন পথ বেয়ে।

কাশ-বল্লী !

সোনার হরিণ

বোকা মেয়েরা ডায়েরী রাখে, বুদ্ধিমতীরা রাখে না।

কথাটা শুনে পাশ ফিরে তাকালাম। আপনি হলেও তাই করতেন। কারণ মনে হচ্ছে যে একটা জলজ্যান্ত নাটকের যবনিকা উঠে যাচ্ছে।

বেশীক্ষণ আড়চোখে তাকানো যায় না। ভদ্রতায় বাধবে। বিলেতে আবার ভদ্রতার বালাইটা বড্ড বেশী। ব্যক্তি-স্বাধীনতার বড়ই অভাব বলে মনে হল এই মুহূর্তে।

তা নাহলে, দেখুন, ওই সুন্দরী তরুণীটির দিকে একবারের বেশী তাকিয়ে দেখতে পারছি না কেন? যাই হোক, কান পেতে রাখলাম।

ওর সঙ্গীর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। ভদ্রলোককে কদিন ধরেই দেখেছি। হোটেলের খাবার ঘরে আমার পাশের টেবিলে বসেন। প্রথম দিনই সেখানে বসবার সময় কায়দা করে কাছাকাছি টেবিলগুলোর লোকদের দিকে একখানা পাইকিরি হাসি বিলিয়েছিলেন। আমার ভাগে ক-আনা পড়েছিল তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমার টেবিলের বুড়ো সুরসিক ওয়েটার তার ষোল আনাই আমার হিসাবে জমা করে দিল।

সেই ভদ্রলোক উঠে যাওয়ার পর ওয়েটার জো আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জ্যাম আর মুচমুচে ক্রোয়াস ঁা—ফরাসী রুটি সাজিয়ে দিতে দিতে বলল,—স্যার, দেখেছেন খেয়াল করে ভদ্রলোকের গোঁফজোড়া?

চমৎকার! খুব যত্ন করে মাথা ঘামিয়ে ওই গোঁফের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল নিশ্চয়ই!

ঠিক বলেছেন স্যার! একেবারে হালের আমেরিকান মটরের 'ফরোয়ার্ড লুকে'র মত। কেমন আগবাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বাঃ, বেশ উপমাটা দিয়েছ তো! মে ফেয়ারের হোটেলগুলোর বদনাম আছে যে সেখানকার ওয়েটারদের মন পাথরে তৈরী। ভারী হাতে টিপলেও অর্থাৎ

বখশিশ দিলেও তাদের মন পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার ভক্তি দেখছি ভদ্রলোককে এক চোখ দেখেই উথলে উঠল।

আমি বিদেশী। ওদের মত অত মেপে-জোখে বরফে জমানো ঠাণ্ডা গলায় কথা বলার অভ্যাস নেই। হপ্তায় হপ্তায় মোটা বখশিশ ব্রেকফাস্ট খাবার পর কফির পেয়ালার নীচে রেখে যাই। কাজেই মে ফেয়ারের ওয়েটাররা আমায় খাতির করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গোঁফসাহেব প্রথম দেখা দিয়েই ওদের মন জয় করে ফেলল? বিনা দক্ষিণাতেই?

জো বলল—স্যার, দেখেছেন ওর স্যুটখানা? নিশ্চয়ই স্যাভাইল রো'তে সেরা দর্জির তৈরী। ওর ফিগারে কেমন খাপে খাপে সহজ ভাবে বসে গেছে। একেবারে সাপের খোলসের মত।

হুঁ, তোমার নজরের প্রশংসা করতে হবে বটে।

বলতে বলতে ভাবলাম ওযেটারটা সাপের কথা তুলল কেন? হিন্দুস্থান সাপ, সাধু আর মহারাজাদের দেশ বলে নয়তো?

ওয়েটার তো উচ্ছ্বসিত। বলল,—আর দেখুন না। কেমন জীবনী-শক্তি উপচে পড়ছে চেহারার মধ্যে। হাইড পার্কে রোজ ভোরে ঘোড়ায় চড়ে রাইড করে নিশ্চয়ই।

বুঝতে পারলাম না এর পরের হপ্তায় টিপ্‌স্ বাড়াতে হবে, না কমিয়ে দেওয়াই ভাল?

পরের দিন জো আবার পাশের টেবিল খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে জুটল। কফির চামচটা যেন ভাল করে সাফ করে দিচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বলল—জানেন স্যার, আপনি তো ডিনার বা সাপারের সময় কখনও এখানে খেতে আসেন না? কাল কর্নেল সাহেবের সব খবর পেলাম সাপারের সময।

সামনে সারাদিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। এই সময়টুকুই যা ফুরসৎ। শোনাই যাক একটু খোশ-খবর।

জো ভক্তিতে চোখ ছোট করে এনে বলল—কর্নেল যুদ্ধে মিলিটারি ক্রশ পদক পেয়েছিল। একেবারে আসল লড়াইয়ে। কিন্তু শুধু বীর নয়, বড়লোকও বটে।

টিপ্পনী কাটলাম—তা তো বটেই, নাহলে এত খরচ করে এ হোটেলে এসে উঠবে কেন ? আমার মত সরকারী খরচে নয়, নিজের রেস্ত ··

জো বাধা দিল—না, না, কর্নেলেরও সরকারী রেস্ত। কাল সন্ধ্যায় 'বারে' হুইস্কিতে সোডা মেশাতে মেশাতে কয়েকটা কথাও ফিস-ফিস করে যেন গ্লাসের ফেনার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছি। উনি সিক্রেট সার্ভিসে আছেন। একটা বিশেষ গোপন কাজে। সেজন্যেই নিজের কোম্পানির হোটেল ছেড়ে গা ঢাকা দিয়ে এখানে এসেছেন কদিনের জন্য।

আজকের মত আমিও গা তুললাম এ পর্যন্ত শুনে।

পরের দিন এই তরুণীকে কর্নেলের বাহুতে জড়ানো অবস্থায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসতে দেখলাম। প্রথমে কোন আমল দিই নি। কিন্তু কানে এল চমৎকার এই কথাটা। 'বোকা মেয়েরা ডায়েরী রাখে, বুদ্ধিমতীরা রাখে না।' এর পরে আর উদাসীন থাকি কেমন করে ?

কান পেতে রইলাম।

কর্নেল বলছেন—তবু, ডিয়ারী, তুমি যখন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, আর আমার স্ত্রী হতে চলেছ, তোমার ডায়েরী রাখতে হবে বৈকি ! কত এনগেজমেণ্ট —ঘোড়দৌড়ে, বোট রেসে, ফ্যাসন প্যারেডে, শেয়াল শিকারে হরদম যেতে হবে। ডায়েরীতে না টুকে রাখলে কোন এনগেজমেণ্ট মিস করে যেতে পার।

তরুণী উত্তর দিলেন—আমি যখন মিস থাকব না, দেখো তখন কিছুই মিস করব না।

তবু নজর রাখা দরকার। এই দেখ না, তুমি হ্যাট অর্থাৎ টুপির সঙ্গে প্রেমে পড়ে আছ। গত হপ্তায় একই দোকান থেকে তুমি পাঁচ-পাঁচটা টুপি কিনেছ, কিন্তু তেমন মানানসই হয় নি, অর্থাৎ কোনটাই তোমার প্রেমের প্রতিদান দিল না।

তুমি তো দিচ্ছ, তাহলেই হল !

ঠিক বলেছ, ডিয়ারী। য্যাসকট রেসে রাণীর বক্সের পাশে বসে কত লেডি আর কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখাশোনা হয়েছে। কাউকে বুঝতে ভুল করি নি। কিন্তু প্রথম ভুল করলাম তোমার বেলা।

আশ্চর্য ! আমি তো খুব সাধারণ সাদাসিধে একটি মেয়ে !

না, তুমি জানো না, তুমি কত অসাধারণ। প্রথম সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় একেবারে চমক লাগল। মনে হল, তোমার মত 'সফিসটিকেটেড' মেয়ে দেখি নি। পরের দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার আগে ফুলের তোড়া কিনতে গেলাম। দোকানী বলল—যদি সোনালী কেশের মেয়ে হয় তবে এই তোড়া নিন, আর যদি কালো কেশবতী হয় তবে এই তোড়াটা।

তুমি কি বললে ?

আমি ভাবলাম যে, সেই সন্ধ্যায় তুমি কোন্ রঙের চুলে উদয় হবে, তার ঠিক নেই। তাই দুটো তোড়াই কিনে নিলাম।

না, না, নিশ্চয়ই তুমি আমায় নিয়ে রগড় করছ। আমি এমন চালাক-চতুর মেয়ে হলাম কবে ? অবশ্য দু-একটা চটকদার কথাবার্তা শিখে রেখেছি পাঁচজনের সঙ্গে মিশবার জন্য।

আমার চোখে, আর সব সমঝদার লোকেরই চোখে তুমি অসাধারণ। তাই তো চটপট তোমায় বিয়ে করে নিতে চাই। অন্য রসগ্রাহীরা তোমার সন্ধান পাবার আগেই।

কিন্তু এত তাড়া কেন বল তো ? এই তো তোমার সব কথাতেই রাজী হয়েছি। তোমার হোটেলে পর্যন্ত এসে উঠলাম। আমাদের বিয়ের পর কিন্তু আর এ রকম খরচ করতে পারবে না। টাকা ওড়ানো আমি পছন্দ করি না।

কিচ্ছু ভেবো না, ডিয়ারী ! টাকা ওড়ানো শুধু সেই খরচকেই বলে, যা নিজের স্ত্রী বা সুইটহার্টের কোন কাজে লাগবে না।

আত্মহারা তরুণীর দিকে একবার আড়চোখে তাকাবার লোভ হয়েছিল পরের দিন আবার জো ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির। খুব জবর খবর। সারা দিন কর্নেল আর তরুণী মোটরে করে ঘুরে বেড়িয়েছে। নতুন শ্যাম্পেন রঙের মোটর ঝকমক করছে হোটেলের সামনের রাস্তা আলো করে। তরুণীর মুখের হাসির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মোটরের ঝিকিমিকি। ওদের বিয়ের আর দেরি নেই। আজ রাতেই সাপার খেতে আসছে লণ্ডনের একজন খুব বড় জহুরী। কর্নেল যা বিশেষ খানার অর্ডার দিয়েছে, তা নাকি কোন রাজা-মহারাজারও হিংসার ব্যাপার হবে। শুনতে চান 'মেনু'র তালিকা, স্যার ?

না, বেল পাকলে কাকের কি ?

ইংরেজীতে এই সুন্দর বাংলা কথাটার অনুবাদ মাঠে মারা গেল। কারণ, শুধু যে ইংরেজীতে মানে বোঝানো শক্ত, তা নয়, কর্নেল এমন সহজ একখানা হাসি ছড়িয়ে পাশের টেবিলে জাঁকিয়ে বসলেন যে, তার পর আর ওদের সম্বন্ধে গল্প শোনা চলে না। ওদের গল্প, ওদের ফিসফিসানিই একমাত্র জিনিস যা শোনা চলে। ওদের টেবিলের দিকেই কান পাতলাম।

তরুণী বলছে—হ্যাঁ ডার্লিং, কি মজাই না করা গেল! সারাটা দিনকে যেন মোটরের চাকার উপরে চড়ানো হয়েছিল। আর কি চমৎকার জোরে তুমি চালালে! কেবল একটা জিনিস আমার ভাল লাগল না।

কোন্‌টা ? আমার গোঁফজোড়ার বাতাসে দোলা ?

ছি, ছি! তোমার গোঁফজোড়া হচ্ছে তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তোমার 'বিগ বিজনেস', বড় কারবারের সঙ্গে ওটা অত্যন্ত মানানসই হয়েছে। আমি পছন্দ করলাম না শুধু, যখন আমরা বড় জেলটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওখানকার শান্ত্রীরা কেমন কেমন ভাবে তাকাল। তোমার দিকে ওরকম করে রুমাল নাড়ল কেন ?

ওঃ, এই কথা! আমি যে ওখানে অনেক সময় 'ওয়েল ফেয়ার' কাজ করতে গেছি কিনা। জানো না তো, দুঃখীর দুঃখভার আমি কমাতে ভালবাসি।

আমাকে কোন দিন ভার বলে মনে হবে না তো, ডার্লিং ?

তোমাকে ? নেভার নেভার ডিয়ারী! অন্য মেয়েরা আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আমার কি আছে তার জন্যই, আমার জন্য নয়। কিন্তু তুমি সে ধরণের নও। আর আমরা দুজনেই পরস্পরের জন্য তৈরী হয়েছিলাম। আমার কেউ নেই আপনার; তোমারও কেউ নেই।

শুধু আমি তোমার হব। কথায় বলে যে স্বামী আর স্ত্রীর লড়াইয়ে শাশুড়ী হয় রেফারী। অবশ্য শুধু এক পক্ষের দিকে টেনে চলে সে। আমাদের সে সব বালাই থাকবে না। কোন আত্মীয়-স্বজনের ছায়া আমাদের উপর এসে পড়বে না।

সে জন্যেই তো বলছি। মনে রেখো কিন্তু যে আজকের পার্টিতে খুব বড়

একজন জহুরী আসছে। রত্ন আর রত্নময়ী দুয়েরই পাকা জহুরী। পৃথিবীজোড়া নাম যে সব ঐতিহাসিক হীরে-জহরতের তাদের গল্প তোমায় কাল বলেছি। সেগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তার মাঝে মাঝে ঝেড়ে দিও। এই ধর, কোহিনূর হীরে, কুলিনান হীরে।

কিন্তু তার কি দরকার?

বাঃ, জান তো কারবারীরা কি রকম নাক-উঁচু সব হয়! ওকে বুঝিযে দিও যে তুমি ওর কারবারের মালের সেরা মালগুলির সম্বন্ধে জানো। অতএব হালের জহরৎ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তুমি অনেক কিছু জানো। যার কাছ থেকে অত টাকার গয়না কিনব তোমার জন্য, সে কেন মনে করবে যে তুমি তার মহিমা বোঝ না! অবশ্য তোমার দাম তো হীরে-জহরৎ দিয়ে হিসেব করা যাবে না, ডিয়ারী!

ওঃ, তোমার চটক আর চাটুকারিতা কোনটাকেই ঠেকানো আমার সাধ্য নেই!

তরুণীর কথায় আমিও মনে মনে সায় দিলাম। সত্যি কর্নেল মেয়েমহলে সব পুরুষের উপর টেক্কা দিয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

পরের দিন সকালে তাড়া ছিল। ঘরের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তরুণী-কর্নেল নাটক কত দূর এগোলো জানি না। রাতে বাইরে থেকে খেয়ে ফিরেছি। টাইটা খুলতে যাব, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

জো'র মুখে দুঃখ আর উত্তেজনা দুই-ই মাখানো রয়েছে। ব্যাপার সাংঘাতিক। কর্নেলের গোঁফজোড়া আসল নয়।

কথাটা হেঁয়ালির মত ঠেকল। ব্যাপারটা সোজা ভাষায় জানাতে বললাম।

সেদিন রাতে কর্নেলের ছোট্ট পার্টিটা নাকি খুব জমেছিল। শ্যাম্পেন আর চিকেন প্রভৃতিতে এমন বনেদী খানা হোটেলে শুধু বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের জন্যই করা হয়। আর তিনজনের টেবিলটার মাঝখানে ছিল একটা পরীর মূর্তি। তাব মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল সোনালী আলোর ফোয়ারা। পানকুঞ্জের আড়ালে বসে সেই আলোয় ওরা সাপার খেয়েছিল। তিনজনের ডিনারের জন্য হাজার

টাকার মত বিল সই করেছিল। প্রায় একশো টাকা ওয়েটাররা বখশিশ নগদ পেলে নিমন্ত্রিতের চোখের সামনেই।

পরের দিন সকালে কর্নেল আর তরুণী সেই জহুরীর দোকানে গেলেন। হাজার বিশেক টাকার গহনা বাছা হল অনেকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত কেনা হল হাজার ত্রিশেকের। কিন্তু চেক ভাঙ্গানোর পরেই কর্নেল সেগুলো হোটেলে ডেলিভারি নেবেন।

এদিকে আজ দুপুরেই যে লণ্ডনের সবচেয়ে বড় হোটেলে লাঞ্চ-পার্টি। তাই এই গয়নাগুলোর মধ্যে বাছাইকরা এই ব্রুচটা এখনই নিলে তরুণী সেটা পরে সেখানে খেতে যেতে পারে। চেকটা তো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভাঙ্গানো হয়ে যাবে। আর ব্রুচটার দাম মোটে হাজার আষ্টেক—মোট ত্রিশ হাজারের সওদার মধ্যে!

এখন সব নির্ভর করছে জহুরীর শিভ্যালরীর উপর। ব্যবসাদার মানুষ, শিভ্যালরী দেখাবার মোকা তো হামেশা মেলে না। তা ছাড়া কাল রাতের শ্যাম্পেনের সোনালী আমেজ এখনও মাথায় চড়ে রয়েছে। ব্রুচটি পকেটে ফেলে তরুণীকে বাহুর মধ্যে জড়িয়ে কর্নেল এসে তার নতুন মোটরে চড়ে বসলেন।

হোটেলে ফিরে তরুণী মনের খুশিতে নিজের ঘরে সাজগোজ করছেন। ডার্লিং ডিয়ারীকে নিজের হাতে ব্রুচ পরিয়ে দেবে প্রসাধন শেষ হলে। এদিকে ঝড়ের মত জহুরী এসে হাজির ঘণ্টাখানেক পরে। হাতে গয়না নয়, চেক। ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ দিয়েছে।

একটু পরেই মোটরের দোকান থেকে লোক হাজির। এত দামী গাড়ি, তার দ্বিতীয় সপ্তাহের ভাড়াই এখনও দেওয়া হয় নি। ব্যাপার বুঝে হোটেলের বিলটিও তরুণীর ঘরে হাজির। একার নয়, দুজনের। সবাই তো জানে যে তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারী যদি সুন্দরী আর অল্পবয়সী হয়, আর কর্তা যদি হয় অবিবাহিত, তাহলে এ-হেন বিয়ে বিলেতে হামেশাই হয়ে থাকে।

গল্পটা শুনে হাঁ হয়ে গেলাম। অবশ্য জো'কে ধন্যবাদ দিলাম যে কষ্ট করে এত রাতেও খবরটা দিতে এসেছে। মনে মনে ভাবছি এ সপ্তাহের বখশিশটা একটু বোধ হয় বাড়িয়ে দেওয়াই ভাল দেখাবে।

কিন্তু কই, জো যে নট নড়ন-চড়ন, নট কিস্সু। কিছু মতলব আছে নিশ্চয়ই।

শেষ পর্যন্ত গলাখাঁকারি দিয়ে খুব নীচু স্বরে জো বলল,—স্যার, একটা নিবেদন আছে।

নিবেদনের কথা শুনে সাবধান হয়ে গেলাম। জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় শান্ত্রীরা কর্নেলের দিকে রুমাল উড়িয়েছিল। দাগী আসামী নিশ্চয়ই। যে রকম করে একটা নিরীহ মেয়েকে ফাঁদে ফেলে পাকা জহুরীকে খেলিয়েছে, তাতে কর্নেলের বাহাদুরি আছে অবশ্য। কিন্তু এ-হেন ধড়িবাজ জোচ্চোরের ঘটনা বলতে এসে সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিবেদন করতে চাচ্ছে জো। ব্যাপারটা নেহাৎ নিরীহ না হতে পারে। কোথায় জিলিপীর প্যাঁচে হয়তো জড়িয়ে যাব। মনটা একটু কঠিন হয়ে উঠল।

স্যার, দি ইয়ং লেডি বড্ড কান্নাকাটি করছেন!

খুব নিস্পৃহভাবে বললাম—তা তো স্বাভাবিক।

জো তবু দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললাম—যারা সোনার হরিণের পেছনে দৌড়োয়, তাদের জন্য খুব বেশী চিন্তার দরকার হয় না।

জো যেন অন্ধকারে দিশা পেল। হাতে তুড়ি দিয়ে বলল—ঠিক বলেছেন। সোনার হরিণ দরকার। আপনি তো নিশ্চয়ই যাদু জানেন! অন্তত জ্যোতিষ। একটু অনুগ্রহ করে বলে দিন না, কোথায় সেই জোচ্চোর কর্নেলের সন্ধান পাওয়া যাবে? তাহলেও মেয়েটির একটা সুরাহা হয়ে যায়।

চুপ করে রইলাম।

তা দেখে জো আরও একটু ভরসা পেল,—অন্তত শুধু হাত দেখেই না হয় বলে দিন।

হেসে ফেললাম। ওর চোখে মিনতি, কিন্তু আমার মুখে হাসি। বেচারা মনে হচ্ছে পরের মুস্কিলে আসানের সন্ধান করছে। তার জন্য ভারতবর্ষের গণতকার, হাত দেখার পণ্ডিত সবারই সাহায্য নিতে সে তৈরী। তাকে সোজাসুজি নিরাশ করতে বাধল।

শুধু বললাম—এ যুগে আর সোনার হরিণ পাওয়া যায় না। তাই যারা হাত দেখত আর জ্যোতিষ করত, তারাও ওই বিদ্যা ভুলে যাচ্ছে। এই দেখ

না, তোমাদের কর্নেলের অমন জলজ্যান্ত গোঁফজোড়া, তা পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে!

তাহলে?

তাহলে, আমি শুধু বলতে পারি গুডনাইট!

গুডনাইট স্যার!

বেচারা জো মাথা নুইয়ে চলে গেল। কেমন একটা মায়া হল ওর উপর। আমার কামরার দরজা খুলে ওকে পিছন থেকে দেখতে লাগলাম। লম্বা বারান্দার আলোগুলোতে ওর ঝকঝকে টাকটা পেছন থেকে সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। সোনার হরিণের সন্ধান দিতে পারি নি, কিন্তু একটি সোনার হৃদয়ের খোঁজ পেয়েছি।

নতুন ধারা

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আর সময় কাটছিল না। শুধু ছোকরা ডাক্তার শ্যামাপদ রায়ই যা একটু-আধটু খোশ-খবর নিয়ে আসে, মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে যায়। ডাক্তাররা আমার পেটের সব কলকব্জা পরীক্ষা করে দেখছে। কোথায় কোন্‌টা বে-কল হয়েছে তা ধরা পড়ছে না।

এদিকে আমিও শুয়ে শুয়ে ডাক্তারের মনের কলকব্জা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করেছি। কারণ ডাক্তারের মন যে এক জায়গায় ধরা পড়েছে এবং কাছে-পিঠেই কোথাও, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।

না হলে কোন্ ডাক্তার ভোর সাতটার সময় এসে রাউণ্ড দিতে হাজির হয়? বড় ডাক্তার আসবে সেই সাড়ে-আটটায়। জুনিয়ার হাউস সার্জনের এত কাজে মনকে তাই আমি প্রথম থেকেই অতি ভক্তি বলে ধরে নিয়েছিলাম।

কি জ্যোতিষবাবু, আজকের দিনটা আমার কেমন যাবে পাঁজি দেখে বলে দিন তো?—বলেই ডাক্তার হাসতে শুরু করবে। আমি অবশ্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কিছুই জানি না। মানিও না। কিন্তু ভোর হওয়াতে, আর হাসপাতালে রাউণ্ড দিতে আসার সুযোগ হওয়াতে, ডাক্তার যে খুশী হয়েছে এটুকু বুঝতে পারি।

তবু যেন কিছুই বুঝি না এমন ভাব দেখিয়ে বলি—তা ডাক্তার, তুমি তো স্টেথিসকোপ লাগিয়ে হৃদয়ের খবর ধরতে পার। তোমার নিজের দিনটা কেমন যাবে সে খবর দিয়েই শুরু কর।

ডাক্তার লজ্জার ভাব মুখে দেখায় না বটে, কিন্তু বড় মিষ্টি হাসে। আহা, বড় ভাল ছেলে ডক্টর রায়। ওর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেছে যে অনেক সময় শুধু শ্যাম বলেই ডাকি।

সন্ধ্যাবেলা যখন সব ভিজিটার বিদায় হয়ে যায়, তখন শ্যাম একবার উঁকি মেরে যায়। এমন কি রাতে খাওয়া শেষেও। হেসে বলে,—জ্যোতিষবাবু, যাবার

আগে দেখে যেতে এলাম কেমন আছেন ! কিন্তু ওর চোখ যে কোন্ দিকে ঘুরে বেড়ায় তা আমার নজর এড়ায় নি।

একদিন শ্যাম খোলাখুলি বলে বসল—জ্যোতিষবাবু, কাঁহাতক আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণবেন, চলুন একবার পাশের ওয়ার্ডটা দেখে আসবেন।

প্রথম দিন গেলাম, একটু কৌতূহল ছিল বলে। দেখে আসি কম খরচের ওয়ার্ডে লোকে কেমন থাকে ? কিন্তু দেখলাম যে শ্যাম একজন রোগিণীকেই যেন একটু বেশী যত্ন করে দেখল। একটু বেশী কথাবার্তা কইল তার সঙ্গে। তা-ও বেশ একটু খুশি হয়ে, অনেক-খানি মমতাভরে। অল্পবয়সী ডাক্তার কথাবার্তায় গোছালো, দেখতে ছিম-ছাম কোন তরুণী রোগিণীর দিকে অমন একটু পক্ষপাত দেখালে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

দুয়েকদিন পরে আবার যেতে হল সেখানে। এবার আরও একটু মমতার ছোপ নজরে পড়ল। কিন্তু ওই ওইটুকু পর্যন্তই। পাশাপাশি বিছানায় জনবিশেক রোগী। এর চেয়ে বেশী নজর দিলে দেখায় খারাপ। তবে যখন আর একজন রোগী গুটি গুটি ডাক্তারের সঙ্গে এসে হাজির হযেছে, তার খাতিরেও তো মিস কুন্তলার বিছানার পাশে ডাক্তারকে একটু বসতে হয়। রোগিণীরও তাতে বিশেষ আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। বরং একটু আগ্রহই যেন দেখা গেল।

আমি লোকটাও নেহাৎ বেদরদী বা বেরসিক নই। এদিক-সেদিক আরও দুয়েকজন রোগীর সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছি। দেখলাম ডাক্তার এ ওয়ার্ডে আগের চেয়ে বেশী ঘন ঘন আসে বলে তারাও খুশি। খুব আলগোছে মিস কুন্তলার বিছানার দিকে একটা চোরা চাউনি হানলাম। সন্ধ্যার পড়ন্ত আলো ওদের মুখে।

কয়েকদিন পরে শ্যাম সন্ধ্যাবেলা আমার কেবিনে আঠার মত লেপটে রইল। আমিই মাঝে মাঝে তাড়া দিই। বলি,—ডাক্তার তোমার সন্ধ্যাবেলার রাউণ্ডটা এখনও আরম্ভ করলে না যে !

শ্যাম প্রথমে কথাটা যেন শুনতেই পেল না। পেটের ভেতরকার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করবার জন্য আমাকে কেন 'বেরিয়াম মিল' ওষুধ-পত্র খাওয়ানো হল তা বোঝাতেই সে ব্যস্ত।

হবেও বা। ডাক্তারের নিজের কাজের দিকে খুব মন। রোগীদের মনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টারও অন্ত নেই।

কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল। বলি, ও ডাক্তার, তোমার যে আজ পাশের ওয়ার্ডের দিকে নজর বড়ই কম !

এবারও ডাক্তারের উত্তর পেলাম না। দেওয়ালে লটকানো চার্টগুলোতে সে মনোযোগ দিয়েছে।

ব্যাপারটা আমার নজর এড়াল না।

এটা-সেটা আরও কিছু কথা হওয়ার পর আবার একটু ইঙ্গিত দিলাম। এবার আরও একটু খোলাখুলি। ডাক্তার তোমার রোগিণী যে বিনা চিকিচ্ছেতে হাঁসফাঁস করছে !

এবার শ্যাম লাট্টুর মত পাক খেয়ে ঘুরে আমার দিকে মুখ ফেরাল। সোজা চোখের উপর চোখ রেখে বলল,—তাহলে, জ্যোতিষবাবু, আপনি সবই ধরতে পেরেছেন ?

বেচারার ভঙ্গি দেখে একটু রসিকতা করবার লোভ হল। মুচকি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলাম—দোষ কার ? যে ধরা দেয় তার, না যে ধরতে পারে তার ?

সইতে না পেরে শ্যাম বলল,—আচ্ছা, হার মানলাম। কিন্তু, জ্যোতিষবাবু, ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। দাওয়াই বাতলান !

চোখ কপালে তুলে বললাম,—সে কি ? ডাক্তারের ওপর ডাক্তারী ? তা দেখ বাপু, চোরের উপর বাটপারির লক্ষণ দেখা দিয়েছে বুঝি ? না, বোঁচকা নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে ?

বর্ষার মেঘ একেবারে জল হয়ে ঝরে পড়ল। আমার দুটো হাত চেপে ধরল তার শক্ত দুটি হাতে। একেবারে অসহায়ের মত আশ্রয় চাইল। ভুলেই গেলাম যে হয়তো ওই হাত দুটোই আর কদিন পরে আমার পেটখানাকে করাৎ-চেরা করে তন্ন তন্ন করে নাড়ীভুঁড়ি উল্টে-পাল্টে কসরৎ করবে।

আপনি অন্তর্যামী, জ্যোতিষবাবু। না-হয় সত্যি জ্যোতিষ জানেন। তাহলে আমার কি হাল হবে তা বলে দিন। শ্যামের গলা ভারী, চোখ ছলছল।

তাহলে তুমি হও আমার রোগী। লক্ষণ সব খুলে বল। আমি হলাম ডাক্তার।

টেবিল পালটে গেল।

শ্যামাপদ আর কুন্তলা দুজনেই ডাক্তারীর ছাত্র ছিল। এক ক্লাসের, এক বয়সের। দুজনে ভাবও হয়েছিল। সংসারে আজকাল এটা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম আর তার পর বিয়ের ঘটনা নতুন জিনিস নয়। কিন্তু একাকিনী কুন্তলা ঘর বাঁধতে রাজী নয়। আর শহুরে ছেলে হলেও শ্যাম সেই স্বপ্নই দেখছে।

শ্যাম বলেছিল,—আমরা দুজনেই যখন কলকাতায় ডাক্তারী করব, এক বাড়িতে থেকে করলে তো সুবিধাই হবে। একই লাইনের কাজ, দুজনে পরামর্শ করে বুঝেশুনে করা যাবে। পরস্পরকে ভুল বোঝবারও কোন ভয় থাকবে না।

তার পর একটু হেসে আরও একটু বলেছিল,—শুধু সন্ধ্যাবেলা দুটো নৌকা এক ঘাটে বাঁধলেই হবে।

কুন্তলা তাতে রাজী হয় নি। বলেছিল—দুটো নৌকোই থাকবে দোটানায়। স্টেথিসকোপ আর ব্যাগে যে হাত জুড়ে থাকবে। হাতে হাত মেলাবার সময় কই?

শ্যাম বেশী কথা কইতে পারে না। তবু প্রাণের তাগিদে বলে ফেলেছিল,—একদিকে থাকবে ব্যাগ, আর আরেকদিকে স্টেথিসকোপ। তার মাঝখানের খালি জায়গাটুকু জুড়ে থাকবে আমাদের দুখানা মিলিত হাত।

বব-করা মাথা নেড়ে কুন্তলা আপত্তি জানিয়েছিল। মন যেখানে মিলে গেছে, সেখানে হাত মেলাবার জন্য এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন? সে কি শুধু নিশুতি রাতে রোগীর বাড়ি থেকে 'কল' এলে রোগী দেখতে বেরোতে মত আছে কিনা সে নিয়ে হাতাহাতির জন্য?

একটু চুপ করে থেকে কুন্তলা জুড়ে দিয়েছিল—ওই মাঝখানের জায়গাটুকুই হবে আমাদের বাঁচোয়া। ওই খালি জায়গাটুকুতে আনাগোনা করবে আমাদের ভালবাসা। ওটাকে বিয়ে দিয়ে ভরাট করে দিলে ভালবাসার ঠাঁই থাকবে না!

তর্কে হেরে শ্যাম চুপ করে গিয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলে শ্যাম নীরব হয়ে বসে রইল। কিন্তু তার পরের ব্যাপার-গুলিও জানা দরকার। তাই আমি আবার একটু কথা জুগিয়ে দিলাম। বললাম,—তাতে কি হয়েছে? তুমি পাল্টা বললেই পারতে যে আজকাল বিয়ে জিনিসটা এত

হাল্কা, এত ফিনফিনে হয়ে গেছে যে, সংসারে কোন জায়গাকেই বিয়ে ভারী করে তোলে না। ভরাটও করে না। বিয়ের দাবি কমে গেছে; ভালবাসার দান গেছে বেড়ে। তাই এ যুগের সাধারণ স্বামী-স্ত্রীতে ভুল বোঝা আর ঝগড়াঝাঁটি কম হবারই কথা। যেখানে হয় সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধই টি ঁকবে না। নতুন আইন হচ্ছে জান তো?

ঠিক বলেছেন আপনি জ্যোতিষবাবু—উৎসাহিত হয়ে উঠল ডাক্তার। আপনার বুদ্ধি নিয়েই এবার থেকে আমি ওকে পাবার চেষ্টা করব। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি জানেন? কুন্তলা যখন আমার কথায় সায় না দিয়ে শুধু বলে—রাগ করো না শ্যাম—অমনি আমি গলে জল হয়ে যাই।

মনে মনে ভাবলাম—বেচারা শ্যাম শুধু জল কেন, ধোঁয়া হয়ে যায়। কুন্তলার ব্যক্তিত্ব যে ওকে নিমেষে উবিয়ে দেয় তা বেশ বুঝতে পারলাম।

কুন্তলাকে যখন হঠাৎ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হল, ডাক্তারের একটা মোকা মিলে গেল। জুনিয়ার হাউস সার্জন হিসাবে সে যখন-তখন কুন্তলার ওয়ার্ডে আসে। সেবা-যত্ন করে প্রাণ ঢেলে। মুখে যে কথা বুঝিয়ে দিতে পারে নি, কাজে তা বোঝাবার এই হল প্রশস্ত সময়। পরস্পরের অসুখ-বিসুখে দেখবে কে? দুঃখের সময় পাশে দাঁড়াবে কে? নিশুতি রাতে রোগীর ডাক এলে হাতাহাতির কথাই শুধু ভাববে কুন্তলা? মাথা ধরলে যে য়্যাসপিরিনের সঙ্গে একখানা মমতামাখা হাতেরও দরকার হবে তা ভাববে না?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম—তা দুজনে নিরালা থেকে যে কথা তাকে সমঝাতে পার নি, ঘরসুদ্ধ অন্য লোকের মাঝখানে তা বোঝানো বোধ হয় তোমার পক্ষে সহজই হয়েছে!

শ্যাম আর সইতে পারল না। বলল—ছাই হয়েছে। খাল কেটে অন্য একটা কুমীর এসেছে!

অভয় দিতে আমি খুব মজবুত। হেসে ফেললাম। কুমীর এসেছে তাতে কি হয়েছে? গায়ে হলুদ মেখে এগিয়ে যাও। কুমীর তো ভাগবেই, চাই কি, গায়ে-হলুদের দিন এগিয়ে আসতে পারে।

আপনি বোঝেন ছাই! এই আপনার সাইকলজি পড়ানোর নমুনা! রাগে গরগর করে বেরিয়ে গেল ডাক্তার শ্যাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এল না। অন্য আর একজন এসে ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে আজ ডক্টর শ্যাম ছুটি নিয়েছে। তার সন্ধ্যার রাউণ্ডটা এই ডাক্তারকে গছিয়ে গেছে। বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে পাশের ওয়ার্ডে একটু উঁকি দিয়ে এলাম। মিস কুন্তলা একা নয়, চুপ করেও নয়। তার ভিজিটারের মুখে খই ফুটছে। আর কুন্তলার চোখে হাসি।

পরের সন্ধ্যায় শ্যাম আবার এল। কিন্তু পাশের ওয়ার্ডে যাবার কোন চাড় নেই। ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। বারান্দার দিকে এক পা এগোয় তো দু পা পেছিয়ে ঘরে ঢুকে আসে। বুঝলাম যে লড়াই করবার মত বুকের পাটা নেই ডাক্তারের।

অন্যের দুঃখের কথা নিজে খুঁচিয়ে তোলা ঠিক নয। তাই আমি চুপ করে আছি। ওদিকে ডাক্তারই বা নিজে কি করে মুখ ফুটে বলে যে তার হার হয়ে যাচ্ছে!

তবু আমি শেষ পর্যন্ত শুরু করলাম—ডাক্তার, তুমি যে কাল এলে না! শরীর খারাপ ছিল না তো?

ডাক্তার করুণভাবে শুধু চাইল একবার।

আবার বললাম—আজও মনে হচ্ছে তোমার শরীর-মন তেমন ভাল নেই। কাউকে তোমার ডিউটি দিয়ে দিলে পারতে।

না-না, তা কি করে হয়? কাজ তো করতেই হবে। খুব নীচু স্বরে উত্তর দিল ডাক্তার। দিয়েই থেমে গেল।

কিন্তু থামলাম না আমি। যে 'ডুয়েল' দ্বৈরথ যুদ্ধে লড়তে চলেছে সে, লড়াইয়ের কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। লড়তে অবশ্যই হবে। আর নিজের কোট বজায় রেখে। যে আগে থেকে বিনা যুদ্ধে সব ছেড়ে দেবে সে তো বীর নয়। বহুকাল থেকে তো কথাই আছে যে সাহসী ছাড়া কেউ সুন্দরীকে পায় না।

বোঝালাম তাকে। বললাম—তুমি কাল আস নি কেন তা বুঝতে পারি, আমি কিন্তু উঁকি মেরে দেখে এসেছি। যা তুমি বলতে পার নি, আর যা আমি আন্দাজ করেছিলাম, তা দেখে এলাম।

আপনি কি দেখে এলেন ?—চাপা উৎকণ্ঠা ডাক্তারের প্রশ্নে।

কিছুই না, আবার সব কিছুই।—এটুকু বলে যেন পত্রিকাতে মন দিলাম।

ডাক্তার ধৈর্য রাখতে পারল না। বলল—বলুন না আপনি, পত্রিকাতে ক্রশওয়ার্ড পাজল নেই যে অমন করে ধ্যান করতে হবে।

কনুয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসলাম। হেসে বললাম—আমি ধ্যান করতে যাব কি দুঃখে? সে তো করবে তুমি। তা দেখ, শুধু যদি ধ্যানই কর তো পাশার দানে তোমার হার হবে। ও হাতিয়ার এ যুগে অচল।

ছেলেমানুষ ডাক্তার, অন্তত আমার তুলনায় তো নিশ্চয়ই। ছেলেমানুষের মত নির্ভর করে বলল - দিন না আমাকে সেই হাতিয়ার যাতে কাজ হবে।

কি করে বোঝাই বেচারাকে? আমাদের রোজকার জীবনের সীমানায় এ জিনিসটা পুরোনো হলেও নতুন। বই পড়ে আমাদের মন পেকেছে, কিন্তু হাতেখড়ি এখনও পাকা হয় নি। মক্স করেই সাধনায় সিদ্ধি নাও হতে পারে। কিন্তু এসব হল ভারী ভারী সাইকলজি মনস্তত্ত্বের কথা। ওতে চিড়ে ভিজবে না;

শুধু বললাম,—দেখ কুন্তলা হচ্ছে একালের মেয়ে। একেবারে স্ট্রীম লাইন করা পালিশ তার মন। তোমার সঙ্গে ওব যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাতেই বুঝেছি। কিন্তু শুধু মন্ত্র পড়ে পাবে না ওর মত মেয়েকে। পেতে হবে মন জয় করে। সেজন্যে তুমি কি করেছ?

বলুন, কি করব?

দেখ ভাই, কোন শাস্ত্রে এর মন্ত্র লেখা নেই। কেমন করে মন পাওয়া যায় তা আমাদের সাইকলজিস্টরাও জানে না।

কিন্তু এত দিন তো মনে হচ্ছিল যে কুন্তলা আমায় ভালবাসে। শুধু বিয়ে করে সংসার পাততে চায় নি এই যা!

এখনও হয়তো ভালবাসে। তুমি আগে থেকেই ভড়কাচ্ছ কেন?

উঁহু, এখনও যদি ভালবাসবে, তাহলে ওই ডাক্তার চৌধুরীটাকে অত আমল দিচ্ছে কেন? কটা গায়ের রঙ আর কড়া ইস্ত্রির ট্রাউজার নিয়ে হাজির হলেই হল, অমনি কুন্তলা ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কত খুশি, কত গল্প-গুজব। আমি লোকটা যেন উবে গেছি! চোখেই আর দেখতে পায় না।

প্রেমকেও লোকে চোখে দেখতে পায় না। কোন দিনও পায় নি। তা বলে কি সে বস্তুটা উবে গেছে সংসার থেকে ?—পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলাম।

কিন্তু একজন প্রেমে পড়েছে কিনা, বা অন্য কাউকে ভালবাসছে কিনা তা বুঝতে কষ্ট হয় না লোকের।

কিন্তু কষ্ট পায় ভুল বুঝেই বেশী !

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল ডাক্তার। জড়িয়ে ধরল আমার হাত। ব্যাকুলভাবে বলল—আপনি বলতে চান আমি ভুল বুঝেছি ? বলুন, বলুন আপনি, কেন তা মনে করছেন ?

আমি কিছুই মনে করছি না ডাক্তার। মনে করবার মত মাল মশলাও আমার কাছে নেই। তবে তোমায় একটা কথা জানিয়ে রাখছি। তুমি হচ্ছ এ কালের ছেলে। যাকে ভালবাসবে সে বিয়েকরা বৌ না-ও হতে পারে। যাকে ভালবেসে বিয়ে করবে তার ভালবাসাও না টিকতে পারে। একালে এ দাম মানুষকে দিতে হবেই। যদি তুমি রাজী না থাক, ফিরে যাও তোমার বাপ-ঠাকুর্দার গ্রামে। তাদের কালের ছাপ মারা কোন মেয়েকে নিয়ে সংসার পাত। তবে একালের ঢেউ যে কোনদিন তার কলসীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না, এ গ্যারান্টি তোমায় কেউ দিতে পারবে না।

আঃ। আপনি কি যা তা বলছেন দাদা ! আমি ভাবছি কুন্তলার কথা। আর আপনি যত্‌তো সব…

হেসে বাধা দিয়ে বললাম—আর আমি যত্‌তো সব কুইনিনের বড়ি ঝাড়ছি ! কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে চিরকালই কুইনিন। তেঁতো, এমন কি বিষ। কিন্তু বিষ খেয়েই আজকের প্রেম হয়ে উঠেছে নীলকণ্ঠ। খাঁটি—অমৃত।

তার মানে ?

মানে খুব সোজা। আজ যদি কুন্তলা তোমায় ভাল না বাসে, আমার নিষ্ঠুর কথাগুলোর জন্যে তুমি ক্ষমা করো ভায়া, তাহলে জানবে যে সে যদি তোমার স্ত্রী হতে রাজী হয়ে থাকে,আর কথা রাখবার জন্য তোমায় বিয়েও করে, তার ভালবাসার মধ্যে ফাঁকি থাকবে। যদি তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা, এত

সুখ-দুঃখের প্ল্যান কষার পরও ওই ডাক্তার চৌধুরীর দিকেই বেশী ঝুঁকে থাকে আর শেষ পর্যন্ত তোমায় এবং আরও অনেককে বাজিয়ে নিয়ে তাকেই বিয়ে করে, তাহলে জেনে নিও যে চৌধুরীকে ভালবাসাটাই খাঁটি।

ওঃ, আপনি যে সোনা কষতে বসেছেন! জহুরী। আপনি পাকা জহুরী, দাদা!

ওর কথার মধ্যে বিদ্রূপ আছে কিনা তা ভাববার মত মন ছিল না। আমি বলে চললাম—সত্যিই আজকালকার ভালবাসা কষ্টিপাথরে যাচাই হচ্ছে রোজ। রাতদিন। ঘোমটার আড়ালে, কৌটোর ঢাকনার নীচে যাকে ঢেকে রাখা হয় নি, তাকে আপন করে রাখতে হবে শুধু তোমার ভালবাসা দিয়ে। সব পুরুষের মাঝখানে তোমাকেই হতে হবে সেই পুরুষ যার জন্যে কুন্তলা পথ চেয়ে থাকবে। ঠিক যে রকম এত মেয়ের মধ্যে কুন্তলাই সেই মেয়ে, যার জন্য তুমি ডিউটি সেরেও হাসপাতালে এসে ঘুরঘুর কর। বল তো ভাই কোন্‌টাতে বেশী সুখ? বেশী লাভ? রোজকার লড়াইয়ে, অহরহ সাধনায় জয়লাভ করে পেয়ে? না, একদিনের গাঁটছড়ায় বেঁধে সিন্ধুকে তালাচাবি দিয়ে রেখে? পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাও। মুখের কথার লড়াইযে যদি বা হেরে যাও, মনের কথাই তোমায় জিতিয়ে দেবে। ভালবেসে মন পাওয়া—সে তো শুধু কথার কথা নয়।

শ্যাম উঠে দাঁড়াল। কোমরের বেল্টটা একটু এঁটে নিল। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।

তাই শেষ কথাটা যোগ করে দিলাম। ঘাবড়িও না মোটেই। চৌধুরীর স্টক বেশী থাকতে পারে, ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিযনেরও তা ছিল।

ডিউক অব ওয়েলিংটন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পা ফেলার মধ্যে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

আবার আটপৌরে প্রফেসারী জীবনে ফিরে এসেছি। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে এক ক্লাসে সাইকলজি পড়ে। সারাদিনে মাত্র ঘণ্টা দুই ক্লাশ। বাকী সময়টা নোট-বই লিখি। আর সন্ধ্যায় প্রত্যাশা করি ডাক-পিয়নের হাতে একটা খামের চিঠি, ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছ থেকে!

সাদামাঠা গল্প

দেখব নাকি একখানা চিঠি লিখে মিসেস রুজভেল্টকে ?

ওদের আমেরিকা হল গিয়ে সোনার দেশ, ডলারে মোড়া। একটা ডলার আবার গোটা চার-পাঁচ টাকার সমান। আমার মানসিক ব্যর্থতার কাহিনী চিঠিতে জেনে দিতে পারেন ডলার দশেক পাঠিয়ে। একজন ইয়ং-ম্যানের ফ্রাস্ট্রেশন (যুবকের মানসিক বৈকল্য) ওদের দেশে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বলে ওরা ধরে নেয়। এই তো সেদিন মিসেস রুজভেল্ট এদেশে ঘুরে বেড়িয়ে গেছেন। এদেশের সব রকম কষ্টই নিজের চোখে দেখে গেছেন। কাজেই আমার চিঠিতে অবিশ্বাস করার মত কিছু থাকবে না। নিজের দেশের মান আর নিজের নাম বজায় রাখবার জন্য নিশ্চয়ই একটা কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দেবেন।

আই-এ পাশ অকিঞ্চন ভাবছে পাশের বাড়ির রোয়াকে বসে। এই সুবিধাজনক রোয়াকটি তার ও পাড়ার আর গুটিকয়েক ছোকরার বিনা খরচের, বিনা খাজনার জমিদারী। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষ্যান্ত-ঝি চেঁচামেচি করে এ নিয়ে। কিন্তু তোর তাতে কি বাবা ? তোর মনিব যখন কিছু বলে না, আর তোকেও আমাদের জন্য একবারও বেশী ঝাঁটা লাগাতে হয় না, তখন কেন এত আপত্তি ?

অবশ্য মনটা যখন প্রসন্ন থাকে—অর্থাৎ যখন মনে হয় যে এই বিজ্ঞাপনটি ঠিক আমাকেই তাক করে কাগজে ছাপিয়েছে বা আজই সম্ভবত একটা বড় চাকরির দরখাস্তের ভাল উত্তর আসবে, তখন অকিঞ্চন মনে মনে ক্ষ্যান্ত-ঝিকে ক্ষমা করে। বলে—কলেজে তো আর পড়ে নি। তাই ও বেচারা জানে না যে 'ডগ ইন দি ম্যাঞ্জার' পলিসি করছে। রোয়াকটি ওর নিজের ভোগেও লাগবে না, তবু আমাদের ভোগ করতে দেবে না, এটা যে কত অন্যায় তা ক্ষ্যান্ত-ঝি জানে না।

তবে সারা দুনিয়াটাই যেখানে আমার উপর অন্যায় করছে সেখানে শুধু পরের বাড়ির ঝি ক্ষ্যান্তর ওপর রাগ করে কি হবে ? কত বড় অন্যায় ভেবে দেখুক

একবার প্রেমোৎপল, নির্ঝর আর নবীন। ওদের কাছেই আমি আজ একথা বিচারের ভার দেব—যখন ওরা এই রকে রোজকারের মত আড্ডা জমাতে আসবে ওরাই বিচার করে বলুক কত ঘোর অন্যায়।

আজ বিকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ আছে। এই খেলাটির উপরই নির্ভর করছে এবারকার লীগ জেতা। অন্যান্য দিন আমি গড়ের মাঠের গড়ের উঁচু দিকটায় দাঁড়িয়ে গলাটা বকের মত তুলে ধরে খেলা দেখার চেষ্টা করে কোন মতে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে ফিরে আসি। কই, কোনদিন তো বাবাকে বলি নি ট্রামের পয়সা দিতে গড়েরমাঠে যাওয়া-আসার জন্য। এমন কি, মার কাছেও চাই নি লুকিয়ে লুকিয়ে। তবে এত কৃপণতা কেন?

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে স্পেশ্যাল। আজ খেলাটির উপর লীগের কলকাঠি নির্ভর করছে, আর কাল রাত্রে বহুবার এই খেলাটির স্বপ্ন অকিঞ্চন দেখেছে ঘুমের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গল তো প্রায় গোল করে দিয়েইছিল। নেহাৎ সে নিজে আকাশ ফুঁড়ে নেমে এসে মান্না সেজে গোল লাইনের উপর থেকে অমন জোরালো কিকটা না করে দিলে কি আর রক্ষে ছিল? অবশ্য, ভাগ্যিস্ ডান পায়ে কিক করেছিল বলে দেওয়ালে পাটা লেগে একটু যা ব্যথা হয়েছে। কিন্তু বাঁ-পায়ে কিক করলে বোগাস ছোট্‌কনটার গায়ে নির্ঘাৎ লাথি লাগত। ও আহাম্মকটি আবার বড় সুশীল ও সুবোধ বালক। চোখে চশমা এঁটে মুখ বুজে বই মুখস্থ করে। খেলাধুলোর মর্ম কিছুই বোঝে না। কাজেই একটি চেঁচামেচি লাগাত।

যাই হোক, গোলমাল কিছু হয় নি। আর এই পায়ের চোটটা মোহনবাগানের কল্যাণ কামনায় সামান্য একটু উৎসর্গ মাত্র। আজ কলকাতার সব লোকই যদি এমন ভাবে একটু একটু আত্মোৎসর্গ করত, তাহলে দেশটি কি আর এত পেছনে পড়ে থাকে না মোহনবাগানের হারার কোন কথা ওঠে?

কিন্তু বাবা বুড়ো অত্যন্ত বে-দরদী। একটুও বোঝে না যে আজকের দিনে অন্তত খেলাটি মাঠের বাইরে থেকে দেখলে চলবে না। অস্পৃশ্যের মত মন্দিরের বাইরে থেকে দেবী দর্শন না করে ভিতরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে দেখা অত্যন্ত দরকার। তাতে শুধু যে প্রাণের শান্তি হবে তা নয়, মনের ডেভেলপমেণ্ট অর্থাৎ

উন্নয়নও হবে। আর সবাই মিলে এক সঙ্গে এক মন এক কণ্ঠ হয়ে একটা দলকে উৎসাহ দিলে জাতীয় একতার দিকেও যে কতখানি এগিয়ে যাওয়া যায়—তার দাম কে বোঝে ?

অন্তত অকিঞ্চনের বুড়ো বাবা তা বোঝেন না। চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামিযে হাতের পত্রিকাটা পাশে সরিযে রেখে কৃতী ছেলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার পর গত রাত্রির হাঁপানীর চোটে দুর্বল বুকটার উপর হাত বুলোতে বুলোতে একটু কেসে জিজ্ঞাসা করলেন,—মোহনবাগানের খেলা ? তার জন্য পযসা চাই ? কিন্তু বাপু, কবে থেকে এ সংসারে দুটো পযসা ফেলবে বলতে পার ? শুধু বুড়োর পেন্সনে যে আর চলে না ! চোখ বুজলে চালাবে কি করে ? দশ দশটা মুখের খোবাক আসবে কোথা থেকে ?

বলেই হাড়কৃপণ বাবা হৃদযহীনভাবে চোখের উপর চশমার ঠুলিটা আবার এঁটে নিলেন। দৃষ্টিপথের বাইবে চলে গেল মোহনবাগান।

চোখের সামনে দিযে যেতে শুরু করল অফিসযাত্রীর দল। এক সময অকিঞ্চন ওদের একটু অনুকম্পাব চোখেই দেখত। ভাবত ওরা সামান্য কটা টাকার জন্য নিজেদের গোলামখানায় বিকিযে দিযেছে। ছিঃ, লেখাপড়া কি মানুষ শেখে এইজন্য ! সে বড় হবে, অনেক বই পড়বে, আনেক বিদ্যা অনেক বুদ্ধিতে সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলেবেলায়। অতএব সে অফিসে কেরানী হবে না।

তার পর আরও একটু বড় হয়ে সে আরও একটা কারণ বের করল যার জন্য সে ওই বৃত্তি গ্রহণ কববে না বলে ঠিক করল। অফিসে কেরানীর অর্থাৎ কলম-মজদুরের কাজ কবে সে পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ চিরকাল বজায রাখতে সহায়তা করবে না। যতদিন পর্যন্ত মার্চেন্ট অফিসগুলি মালিকের টাকা সমান-ভাবে সবাইযের মধ্যে ভাগ করে দেবার বন্দোবস্ত না করছে, আর সরকারী অফিসগুলিতে সকলের সমান মাইনের হার না চালু হচ্ছে, অন্ততপক্ষে ভিতরে ভিতরে বুর্জোয়া কংগ্রেসের পাঁচশো টাকার নিয়মটি কাজে না লাগানো হচ্ছে, ততদিন সে অফিসের ছায়া মাড়াবে না। সে পাবে পঁচিশ আর ম্যানেজিং ডিরেক্টার পাবে পাঁচ হাজার, এই অসম্মানজনক ব্যবস্থার মধ্যে সে নেই।

সরসী অবশ্য সেরকম যুগান্তকারী সংস্কার না আসার আগেই দল ভেঙ্গে চাকরিতে ঢুকে পড়েছে আর সকাল-বিকেল চিনির ভারবাহী সেই বিখ্যাত জন্তুর মত অফিস আর বাড়ি করছে। অফিসের মুনাফা ভাগে বা ভোগে কোন কিছুতেই সে নেই। আছে শুধু হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে গরীবের রক্তশোষা মুনাফাটা বাড়িয়ে দেবার জন্য। সরসী অবশ্য বলেছিল যে বাপের বিনি পয়সার হোটেলে আর চলছে না বলেই নেহাৎ চাকরি নিতে হয়েছে। কিন্তু ওসব ওজরে ভবীরা ভোলে নি। কেন, বাপ-মার দায়িত্ব নেই নাকি আমাদের প্রতি যে আমাদের আদর্শ নষ্ট করে শিঙ ভেঙ্গে গোয়ালে ঢুকতে হবে? আমরা জন্মেছি বড় কাজের জন্য। শুধু ডাল-ভাতের বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে জীবনটা ঘানিতে জুতে দেবার জন্য নয়। যতদিন সেই বড় কাজ হাতের কাছে না এগিয়ে আসছে, ততদিন অবশ্য এমনি করে রোয়াকে বসে সে সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে আদর্শটা জীইয়ে রাখতে হবে।

সেকথা মনে হতেই অকিঞ্চন ভেতরে ভেতরে একটু বল অনুভব করল। শরীরটা নাড়াচাড়া দিয়ে একটু বুকটা চিতিয়ে বসল। সাদামাঠা জীবন তার জন্য নয়।

কিন্তু আজকের ফুটবল ম্যাচটা? সামান্য এই ক-আনা পয়সার জন্য বুড়ো বাপের কাছে হাত পাততে হয়। কথাও শুনতে হয়। আবার তাতেও পয়সা মেলে না।

এরকম অসহ্য অন্যায় আর কতদিন সওয়া যায়? রাগের চোটে নতুন কিছু ভাববে বলে সে ঠিক করল। নতুন কিছু। ভাবতে শুরু করল অকিঞ্চন। এরকম-ভাবে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাই ভাল, না কখনও কখনও বিশেষ ব্যাপারের সময় বাড়িতে হাত পেতে চেষ্টা করে দেখাই ভাল, না একটু লুকিয়ে লুকিয়ে আদর্শ ভেঙ্গে কিছু কাজ করে উপায়ের চেষ্টা করা চলতে পারে? কই, এখনও নবনী নির্ঝর এরা এসে পেঁাছোয় নি। নিরিবিলিতে একটু ভেবে দেখা যাক। ওরা এসে হাজিরা মারলে এসব কথা আর ভাবতে দেবে না। এরকম কথা ওদের কাছে পাড়তেও লজ্জা করবে।

না, মিসেস রুজভেল্টের কাছে লিখে কোন সুবিধে হবে না। গোটা কয়েক

টাকা অবশ্য দিতেও পারে পাঠিয়ে, কিন্তু তা পেলেই নবনী কোম্পানি তাতে ভাগ বসাতে চাইবে। অন্তত নীলকণ্ঠ কেবিনে রোজ সন্ধ্যায় খাবার তাগাদা দিয়ে সত্যিকারের সোস্যালিজম চালাবে আমার পকেটের ওপর। তার পর আবার পকেট গড়ের মাঠ, আর আবার সেই একই চালচুলোহীন অবস্থা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তার চেয়ে একটা বাঁধাধরা উপায় মন্দ নয়। কিন্তু কই, তার তো কোন পথ দেখছে না অকিঞ্চন। ওসব লেখাপড়ার লাইনে কিছু সুবিধা হওয়া বড় শক্ত। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য অনেকগুলি "দিবস" সে পালন করতে কসুর করে নি। ভিড়ের মধ্যে পুলিসের ব্যাটন আর গুলির ভয়ও সে করে নি। ভেবেছিল যে ভিয়েৎনাম দিবস পালনের মধ্যেও ভারত স্বাধীনতা দিবস মেশানো আছে, ভেবেছিল টেনিসনের 'সেই চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড' কবিতাটায় সৈন্যদের মত—

Their's but to do and die,
Their's not to reason why.......

তারও স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু প্রাণ ঢেলে এগিয়ে যেতে হবে নির্বিচারে। সেই ডিসিপ্লিনেই হবে তার পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় অবশ্য পাশ সে করেছে, তবে দুর্ভাগ্যের কথা, কলেজের এ্যানুয়াল পরীক্ষায় পাশ করে নি আর পার্শেণ্টেজেও যে ঘাটতি পড়েছে তা বুঝতে পেরে সে নিজে থেকেই কলেজ থেকে রেহাই নিয়েছে।

তার পর এই রোয়াকে সে রোজ পার্সেণ্টেজ কমাচ্ছে।

ইতিমধ্যে যারা স্বার্থত্যাগ করল না, দেশের জন্য যুদ্ধ করল না, নির্বিবাদে পাশ করে গেল, তারাই এখন চাকরির বাজার গুলজার করছে। এমন জমাট ভাবে যে, কোন ইস্কুলে পর্যন্ত তার মাস্টারী জোটানো শক্ত।

তার চেয়ে ভাবতেও মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল অকিঞ্চন—আজ একবার অফিস-পাড়াটা ঘুরে আসা যাক। যদি কিছু জুটে যায়। অন্তত প্রথম কিছু দিন নবনী কোম্পানিকে কিছু না বললেই চলবে। একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে।

চোখটা ওপরে তুলতেই সামনের বাড়ির জানালায় অতসীর দিকে নজর পড়ল।

অকিঞ্চনের বোনের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে। এবার ইণ্টার দিয়েছে, পড়াশুনোয় খুব মন। ভারী ইণ্টারেস্টিং মেয়ে। ওর সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ওর কথা ভাবতে, ওকে হঠাৎ দেখতে পেতে খুব ভাল লাগে। বোনের বন্ধু, সেই সুযোগে একটু ভাবসাবও যে করবার চেষ্টা না করেছে তা নয়। খুবই ভাল লাগে ওকে। সত্যি কথা বলতে কি, যত দিন যাচ্ছে ততই বেশী ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু লাভ কি? ভাল লাগায় কোন লাভ নেই, যদি তার পিছনে আরও কিছু না থাকে। অকিঞ্চন জানে যে অতসীর বাবা-মা ওর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। বলছে যে হাতের কাছে এমন কোন পাত্র তো নেই, কাজেই এখন থেকেই খোঁজখবর না নিলে চলবে কেন? হাজারটা সম্বন্ধ আর লাখটা কথায় একটি বিয়ে। কাজেই বছর দু-তিন আগে থেকেই খোঁজখবর নিতে শুরু করা দরকার।

কিন্তু হায় তার ঘাটে কোনদিন নিজের নৌকা ভিড়োবার আশা নেই অকিঞ্চনের। শুধু অতসী কেন, কোন মেয়েই তাকে ভিড়তে দেবে এমন আশা সে ঠিক এই মুহূর্তে করতে পারছে না। কলেজের ভাল ছাপ তার কপালে পড়ল না। সময় কাটছে রোয়াকে না হয় পাড়ার মাঠে। কোন অফিসে বা কাজের মধ্যে নয়। ভবিষ্যতের জন্য কোন রঙিন আশা নতুন পথ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই অতসীর মতই সব কিছু জানলার পিছনে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে একটু গরম হয়ে উঠল কানের ডগাটা। তাহলে সব কিছু পাওনা, সব কিছু চাওয়ার মত জিনিসই ওই জানালার লোহার শিকের পিছনে আড়াল হয়ে যাচ্ছে? সব কিছুই ছিনিয়ে নিতে হবে নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিচয় দিয়ে? বাপের হোটেলের কল্যাণে যে দেহ বাঁচানো যেতে পারে, আড্ডা, ম্যাচ ও হৈ-হৈ যে উত্তেজনা প্রাণে সঞ্চার করে, তাতে বেশী দূর এগোনো যাবে না। পাড়ার লোকে এর মধ্যেই যে ওকে বকা আর বাউণ্ডুলে বলতে শুরু করেছে এমন কথাও মা চোখের জল মুছতে মুছতে দুয়েকবার বলেছে ওকে।

নাঃ, এর একটা বিহিত করতেই হবে। সে গা আড়ামোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙ্গে উঠে পড়ল। নবনী কোম্পানির সঙ্গে এবেলার মত আড্ডা দেওয়া আর হল না।

অকিঞ্চন কয়েকটা অফিসে ঘোরাফেরা করেই বুঝল যে চাকরির বাজারটা

কলেজের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার। বাবার সময়কার চেনা কয়েকজন বড়বাবুর কাছে গিয়ে সে ধরণা দিল। কিন্তু চাকরির উমেদারি আর উমার তপস্যা, সে দেখল, সমানই শক্ত কথা। প্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছে বুঝলেই, মহাদেব অর্থাৎ মহাবাবুর দুই নেত্রই সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফাইলে ধ্যানস্থ হয়ে যায়।

সে অনেক অনুনয় করল। অনেক গলা-খাঁকরি দিল ও বিগলিত ভাব দেখাল। কিন্তু কিছুতেই বর পাবার ভরসা পর্যন্ত পেল না। ধ্যান যদি বা ভাঙ্গে, বড়বাবু এমন ভাবে তাকান যে নেহাৎ কলিযুগ না হলে অকিঞ্চন একেবারে ভস্মই বোধ হয় হয়ে যেত। এত রাগ, এত তাচ্ছিল্য।

তাতে অবশ্য তার সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ই হতে লাগল। বেকার-জীবনের অবসান আজই ঘটাতে হবে। এখনও কয়েকটি চেনা অফিসে চেষ্টা করা বাকী আছে। সম্ভব হলে একটা হেস্তনেস্ত আজই করে নিতে চায়। এখন আর নববী কোম্পানির আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া বা ফুটবল ম্যাচ দেখতে না পাওয়া তাকে বিচলিত করে তুলছে না। হাউই বাজীর মুখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলেছে—সে ক্লান্ত হয়ে, ক্ষুন্ন হয়ে, প্রায় নিরুৎসাহ হতে হতে অন্য একটা অফিসে ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বলতে লাগল—হাউই বাজীর মুখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলেছে; আজই এটাকে ওড়াতে হবে আকাশে, পলতে জ্বলে শেষ হয়ে যাবার আগে।

কিন্তু হায়! পলতে জ্বলে ছাই হয়ে গেল এবং সে ছাই মেখে অকিঞ্চন ভীষণ একটি কিছু করবে ঠিক করে ফেলল।

শেষ যে অফিসে সে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেল সেখানে বড়বাবুর শিবের ধ্যান আর কেউ বোধ হয় একটু আগেই ভাঙ্গিয়ে গিয়েছিল। মদনভস্ম তৎক্ষণে হয়ে গেছে। কারণ মদন অন্তর্ধান করে আত্মরক্ষা করেছে। চাপরাসী দাঁত বের করে হেসে কাঠের বোর্ডটি চোখের সামনে তুলে ধরল- বড় বড় করে লেখা আছে: চিরকালের জন্য নো ভেকান্সি। তাতেও সে দমল না। কারণ সামনে বেড়া দেওয়া থাকলেও খিড়কি দিয়ে যে ঢোকা যায় সে কথা সে অনেক শুনেছে। অতএব সে যখন ঢুকতে চাইল, চাপরাসী তাকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে সরবে জানিয়ে দিল, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

তবু সে আবার ঢোকবার চেষ্টা করছে, এমন সময় দেখল বড়বাবুই বোধ হয় নিজে বেরিয়ে এলেন। চড়া গলায় বললেন, এই যে, আর এক ছোকরা ভ্যাগাবণ্ড, চাকরি চাও নিশ্চয়ই ! আরে বাবা, চাকরি তোমার বাপের পোতা গাছের ফল কিনা, ঝেড়ে নামালেই মুখে এসে সেধোবে। বলি, ক-জন্ম তপস্যা করেছ ?

আত্মসংবরণ করে সে বলল, স্যার, একটি ছোটখাট চাকরি হলেও চলে যায়।

ব্যঙ্গের কোন প্রয়োজন ছিল না। বড়বাবুর মুখটিই একটি ব্যঙ্গ। তার উপর তিনি যখন আরও ব্যঙ্গের বিকাশ করলেন, তখন অকিঞ্চনের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়তে লাগল,—চলে যায় ! বটে, ছোট চাকরিতেই চলে যায় ? অবশ্য বড়সাহেব হয়েই তোমাদের শুরু করা উচিত, কেবল দয়া করে ছোট চাকরিতেই চালাতে চাও। যাও না, ওই যে বেগ বরো এণ্ড স্টীল কোম্পানি আছে, ওখানে বড়সাহেব হয়েই শুরু করতে পারবে। যাও, যাও, যত্তো সব ভ্যাগাবণ্ড।

বলেই তিনি আঙুলটা যেদিকে এগিয়ে দিলেন সেটা তার নিজের বড়সাহেবের কামরা না ওই নামের কোন অফিসের পথ তা ঠিক বোঝা গেল না।

সিঁড়ির মাথায় নেমে আসছে, এমন সময় অকিঞ্চন শুনতে পেল চাপরাসী মহা-বীরত্ব দেখিয়ে আস্ফালন করছে,—হামি তা আগে ভি বলিয়েছে, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

সর্বত্রই নেই নেই রব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাউইয়ের ছাই অকিঞ্চনের মনকে ঢেকে দিচ্ছে এতক্ষণে। উৎসাহ নিভে গেছে এবং সে ঠিক করেছে যে কলকাতায় স্কোপ এত কম এবং চাকরি নিয়ে কাড়াকাড়ি এত বেশী যে এখানে ওর মত লোকের কোন আশা নেই। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন মনে সে হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। অন্যমনস্ক ভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে ভিতরেও ঢুকে এল। সারাদিনের ব্যর্থতার পর মন এত ক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন যে সে আর ভাবতেও পারছে না যে এর পর কোথায় যাবে বা কি চেষ্টা করবে ! তবে কলকাতায় যে ওর কিছু হবার আশা নেই, এমন একটা সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে। কাজেই খালি পকেটে ও বিনা টিকিটে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে নতুন জায়গায় একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কোন্ ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে সুবিধামত ওটা যায় তা ভেবে দেখবার জন্য সে প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চে বসল। এই কলকাতায় কিছু হবে না। বাইরে কোথাও গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে হবে।

পশ্চিমের একটা ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। সামনের একটা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে একটু দিশেহারার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে দেখে টিকিট-চেকার এসে টিকিট পরীক্ষা করে নিয়ে নিল। লোকগুলি যে কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এদিক-সেদিক চেয়ে ওরা অকিঞ্চনের পাশে ও পিছনে লাগানো বেঞ্চের ওপাশে বসল।

কিছু করবার নেই বলে অকিঞ্চন ওদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখল। নেহাৎ দেহাতী লোক, শক্ত-সমর্থ কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নতুন। হাবভাবে একটু বিব্রত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। লোটা ও পুঁটলির দৈন্য দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে ওদের পকেটও তার নিজেরই মত প্রায় গড়েরমাঠ। ভাল করে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা নিজেদের গেঁয়ো ভাষায় কথা বলছে। অকিঞ্চন ভাবল, ওরাও তার নিজের মত টাকার সন্ধানেই বেরিয়েছে। বেঁচে থাকার সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। তার মতই ওরা স্বদেশ থেকে পলায়ন করেছে।

সে সমস্যা ওদের ব্যাকুল করে তুলেছে। পোঁটলা থেকে একটা আলুমিনিয়ামের গ্লাস বের করে প্ল্যাটফর্মের কলের জল খেতে খেতে একজন সে কথা তুলল। জয়পুরের কোন গ্রাম থেকে অনির্দিষ্টের অদৃষ্টের সন্ধানে এই বিরাট শহরে এসে পড়ে সে একটু যেন ভড়কিয়ে গিয়েছে মনে হল। অন্য সবাই তার মতই ভড়কিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একজন বলে বসল যে ভয় পাবার কিছু নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরে একবার পা দিতে পারলেই হল। তার শোনার মধ্যে বহুলোক আছে যারা তার মত নিঃসম্বল হয়ে এখানে এসে এখন শ্রীধনধনিয়াজী ইত্যাদি নাম নিয়ে লাখপতি হয়ে বসেছে।

আর একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—বল নি কেন এতক্ষণ? তাহলে ধনধনিয়াজীর কাছেই তো এখন যাওয়া যেতে পারে। আজ রাতটা ধর্মশালায় কাটিয়ে কাল তার কাছে গেলে ছোটখাট একটা চাকরি তো জুটিয়ে দিতে পারবে। অন্তত আরম্ভ করবার মত।

প্রথম জন প্রতিবাদ করে উঠল মনে হল। বেশ ঝাঁঝ দিয়ে বলল, চাকরি করণে মাটে কই ফয়দা নৈছে। সে আরও কি সব বলে গেল বোঝা গেল না। এটুকু বোঝা গেল যে, গেলামে হ দেখতা দেখতা হি কামালুঁ লা।

'গেলামে' জিনিসটা কি? কোথায় ওরা দেখতে দেখতে টাকা কামাই করবে? উৎসুক হয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল অকিঞ্চন।

ওরা যদি 'গেলা' থেকে দেখতে দেখতে টাকা করে নিতে পারে সেই বা কেন পারবে না? বাপের হোটেলে এত কিছু সমাদর বা যত্ন সে পেতে অভ্যস্ত নয় যে একটু কষ্ট করে বাজারের ভিড়ে বা রাস্তার ঠেলাঠেলিতে নিজের একটু ঠাঁই করে নিতে পারবে না। ওরা অত দূর থেকে কষ্ট করে এসে আস্তানাবিহীন অবস্থাতে মূলধন ছাড়া যা পারবে, অন্তত মাথা গোঁজবার জায়গা যার আছে সে কলকাতায় নিজের চেনা কোটায় তা করতে পারবে না?

এতক্ষণে বোঝা গেল, গেলা মানে রাস্তা। আচ্ছা, ওরা এত কাজের লোক যে রাস্তা থেকেই টাকা কামাতে পারবে? তবে সে নিজে তা পারবে না কেন? ফেরি করে, রকের কোণায় প্যাকিং বাক্সের কাঠের দোকান দিয়ে আজকাল উদ্বাস্তুরাও নিজেদের সংস্থান করে নিচ্ছে। তবে কেন আমি পারব না? কোন না কোন পথে পারবই। থাকুক ড্যালহাউসি স্কোয়ারের তপস্যা পিছনে পড়ে। আমি এগিয়ে যাব। পালাব না।

অকিঞ্চন ঠিক করল সে আর মিছেমিছি সময় নষ্ট করবে না। ওই দেহাতী জয়পুরী লোকগুলি বলেছে যে কলকাতায এত উপায়ের পথ পড়ে আছে যে যো কি মর্জি আবে ওই লে যাবে। তারও মতি এসেছে, সেও নিজের পথ নিতে পারবে। সাদামাঠা ভাবেই তার প্রথম জীবন শুরু হোক।

দৃঢ় পদক্ষেপে একজন নতুন মানুষ প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হয়ে আসছে। সামনের লম্বা রেলিংগুলি ওকে বাধা দিতে পারবে না। জানালার শিকের ওপারে অতসী ও সংসারের আরও বহু চাওয়ার ধন তার পাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে।

বাল্মীকি

ফুলের মালাগুলি গলায় অসহ্য ঠেকছে।

শুধু অসহ্য নয়, ভারী আর গরম। গলাটা হাল-ফ্যাশনের গলাবন্ধ প্রিন্সকোটের কাছে বাঁধা দেওয়া। কিন্তু রায় সাহেবের তাতে কোনদিন অসুবিধা হয় নি। তাব আগের জমানাতে কলার আর টাই পড়তেন কিনা। কিন্তু আজ চাকরি জীবনের শেষ দিনটি। এতকালের বন্দী গলাটার আজ মুক্তি হবে। তবু আজই বাঁধনে অভ্যস্ত গলায় ফুলের মালার বাঁধন সইতে পারছেন না।

মিস্টার রত্নাকর রায়। ভুল বুঝবেন না যেন। মিস্টার—এখনও শ্রী বলা পছন্দ করেন না। দেশী নামে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ট্রাডিশনটা তিনি বজায় রাখতে চান। সর্বদা তাই করে এসেছেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের আবহমান ধারা তিনি স্বাধীনতার আমলে সমানভাবে চালিযে এসেছেন। আজকের বিদায় সভায় সেজন্যে বিশেষ করে তাঁর গুণগান হয়েছে। বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় জেলার বড় জজ। নেহাৎ প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক, তাই মোটে সিলেকশান গ্রেড পর্যন্ত পৌঁছেছেন। হাইকোর্টের বুড়ি-ছোঁয়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তাঁর বিচারের সুনাম করেছে মামলার দুই পক্ষই। স্বাধীন মতের সম্মান দিয়েছে গবর্নমেণ্ট। স্বাধীন যুগে রায় বাহাদুর খেতাবটা উঠে গেছে অবশ্য। কিন্তু লোকে তাঁকে এখনও বলে থাকে মিস্টার রত্নাকর রায়—বাহাদুর। বলে থাকে, ভালবাসে বলে।

শেষ বক্তা ছিলেন সেখানকার একজন নামী সাহিত্যিক। বেশ ভাষার দখল দেখিয়ে, গলায় কাঁপন তুলে সভার মন একেবারে গলিয়ে দিলেন। বড় বড় মামলাগুলো থেকে জজসাহেবের জোরালো রায়ের টুকরো টুকরো দার্শনিক অভিমতগুলো তার মধ্যে ঝেড়ে দিলেন। খবরের কাগজে উঠত সেসব রায়ের টুকরো। হাইকোর্টের আপীলে ফুল-বেঞ্চ সেসব পড়ে শোনাতেন কোর্টকে। এমনি গালভারী আর জ্ঞানে ভারী সেসব বাণী।

একটা মামলায় ছিল খুন আর নারীহরণ। তার জুরীর প্রতি বক্তৃতায় নাকি

তিনি লিখেছিলেন যে এই মামলার হেলেনের মুখখানা হাজার জাহাজ ভাসায় নি, কিন্তু হাজার লাঠি যোগান দিয়েছে দাঙ্গাবাজদের হাতে। এই মামলার প্যারিস তার সমস্ত ভাই-বেরাদরকে ট্রয়ের সৈন্যসামন্তে দাঁড় করিয়েছে। জেণ্টেলমেন অব দি জুরী, আপনারা বিবেচনা করবেন যে এই মামলার মেনেলাস আর অন্যান্য আসামীদের আপনারা শুধু কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের (ঠাণ্ডা মাথায় খুনের) অভিযোগে দোষী দেখছেন কিনা। বিজ্ঞ হোমারের মত দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ঘটনাটা বিচার করুন।

পুরোনো পত্রিকা থেকে পড়ে গেলেন সাহিত্যিক। হাইকোর্টও জজসাহেবের এই জুরীর প্রতি বক্তৃতা থেকে অনেক টুকরো নিয়ে আলোচনা করেছিল। তারিফ করে বলেছিল যে জজসাহেব হোমারের মত দিব্যদৃষ্টি আর বিচার-বোধ দিয়েই মামলাটা বিচার করেছেন। এত গোলমেলে জটিল সাক্ষী প্রমাণ ঘেঁটে এমন সুবিচার করা শুধু অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ নয়। সত্য আর সাধুতাই আছে এর মূলে।

পড়তে পড়তে গদগদ হয়ে সাহিত্যিক বললেন—ভারতবর্ষের এই অসাধারণ সত্যপ্রিয় সাধুতার অবতার বিচারককে আমরা বলব না রত্নাকর—তিনি হচ্ছেন বাল্মীকি।

কানে কি চোট পেলেন জজসাহেব? বক্তৃতা শুনতে শুনতে কানে, দু কানেই যেন আঙ্গুল দিয়ে চুলকোতে লাগলেন। বিদায়-অভিনন্দনের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বিশেষ কিছু জুৎ করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে গলার শেষ মালাটাও নামিয়ে ফেললেন। গলার কোটের বাঁধনটা ফেললেন খুলে। এক গ্লাস জল খেয়ে নেহাৎ জোলো যাহোক কিছু বলে আবার বসে পড়লেন।

বাল্মীকি। বাল্মীকি।

বাল্মীকি তখন নদীর পারে একটা আঘাটায় ছিপ ফেলে মাছ ধরা মক্স করছিলেন। পূব বাংলার ছোট্ট মহকুমা শহর। তর সর্বময় কর্তা সদরালা হয়ে বিরাজ করছেন। এস. ডি. ও. সাহেবের সাহেবী চালচলন আর মেজাজ। বিলেত অবশ্য যান নি। নেহাৎ সুযোগ পান নি বলে। কিন্তু যে জিনিসটা শিখতে সুযোগ পেয়েছেন তাতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। যে স্টেশনে—মানে

ইস্টিশানে নয়, সরকারী হেড আপিস শহরে—টেনিস নেই, গল্‌ফ্‌ নেই, সেখানে ইংরেজ এস. ডি. ও. সাহেবরা করেন ফিশিং।

অর্থাৎ ছিপ হাতে বসে ছুটির দিনটা কাটান পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে। গাছে থাকে ছায়া আর হাতে বিয়ার। সন্ধ্যের পর ক্লাবে তাঁর গল্প সুরু হয়। রাত যত বাড়ে সেদিনকার 'ক্যাচ' অর্থাৎ ধরা মাছটার সাইজও ততই বাড়ে। তাতে অবশ্য কেউ দোষ ধরে না। কারণ শখের শিকারীর ধরা মাছই নাকি পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ে।

কিন্তু গেল হপ্তায় এস. ডি. পি. ও. অর্থাৎ মহকুমার পুলিস সাহেবের মাছই নাকি সবচেয়ে বড় ছিল। কাজেই এস ডি. ও. সাহেবের এই রবিবারের সাধনাটা একটু বেশী কড়া। আরও বড় একটা মাছ ধরতে হবেই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু পাশেই যে নৌকোটা বাঁধা আছে তার ভেতরে মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁর খেয়াল হয় নি। তাহলে এখানে এসে খুঁটি গাড়তেন না।

এক মালাই নৌকো। তার ছইয়ের নীচে লোকের চোখের আড়ালে যারা লুকিয়ে কথা বলছে তারা একটি পুরুষ আর একটি নারী। এস. ডি. ও. সাহেব একটা গলা-খাঁকরি দিয়ে ওদের ভাগিয়ে দেবেন কি? ফিশিংটা যে নাহলে মাটি হয়।

কিন্তু মেয়েটির গলার স্বর ভারি মিঠে, ভারি আকুলতায় ভরা। শোনাই যাক না কি কথাবার্তা হয়।

রঞ্জু আর অঞ্জনা। বুঝেছি, সেই চিরকেলে পুরোনো কাহিনী।

তুমি যেমন করেই হোক একটা চাকরি যোগাড় কর। বাবা কিছুতেই বেকারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। রঞ্জু, রঞ্জু যেমন করে পার, এই চাকরিটি তোমায় পেতেই হবে। তাহলে এখনও একটা চেষ্টা করা যায়।

মেয়েটির অনুনয়ের উত্তরে রঞ্জু যা বলল তাতে সাহেব খুশিই হলেন। এস.ডি. ও. ভীষণ রাশভারী লোক। যেমন তাঁর দাপট তাঁর তেমনি নিরপেক্ষতা। যে তাঁর কাছে নিজের চাকরির সুপারিশ করতে যাবে বা মুরুব্বি পাঠাবে নির্ঘাৎ তার নাম কাটা যাবে। ওঃ বাবা। তার চেয়ে সিংহের গুহায় মাথা গলানো সহজ।

ছোট্ট মফঃস্বল শহর। চাকরির সুবিধেই বা কোথায়? আর যদি বা এক-আধটা চাকরি থাকে রঞ্জিতের মত নামকরা অকেজোর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বেই বা কেন? তার উপর এস. ডি. ও. সাহেবের কাছারীতে। তার বাঁশী বাজানোটা হয়তো একটা অযোগ্যতা বলেই সাহেব ধরে নেবেন।

অঞ্জনা? মাই গুডনেস! ওই রাজকন্যার মত সুন্দর মেয়েটা? ওর সঙ্গে প্রেম এই বাঁশুরে রঞ্জিতের? রত্নাকর রায়ের মধ্যে এস. ডি. ও. হাকিম জেগে উঠল। তিনি কান পেতে রইলেন। শুধু সুশাসন নয়, সামাজিক নিঝ'ঞ্ঝাট অবস্থাও তাঁর কাজের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে বলে তিনি মনে করেন।

বাঁশীর সুরের মত করুণ শোনাল অঞ্জনার কথা। সে বলছে,—না, না রঞ্জু। এস. ডি. ও. সাহেব এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আমি নিজেই আজ তাঁর বাংলোতে গিয়ে দেখা করব। অনুরোধ করব যে এই চাকরিটা যেন তোমাকেই দেন। দরকার হলে খোলাখুলি সব বলব। দুটো জীবন কি তিনি এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন?

বিষণ্ণভাবে রঞ্জু উত্তর দিল,—তুমি জানো না সাহেবের কথা। ন্যায়-বিচারটা ওঁর নেশা। মনটা একেবারে পাষাণের মত। তুমি যদি বল যে আমি চাকরিটা পেলে তুমি বাপ-মায়ের অমতেও আমায় বিয়ে করবে তাহলে সোজা আমায় তাঁর এলাকা থেকে বের করে দেবেন। পেয়াদা সঙ্গে দিয়ে রাতারাতি খেদিয়ে দেবেন।

তাহলে? আমার বিয়ের দিন যে ঠিক হয়ে গেছে।

কোন পথই নেই? আমি মরে যাব তোমায় না পেলে। আমার ভাগ্যে তাই আছে।

ছিঃ? অমন কথা মুখেও আনতে নেই। আচ্ছা, তুমি এসব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা ভাবতে পার, তবু সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পার না? বোঝাতে পার না ওঁকে তোমার দরকারটা?

নাঃ বাবা। তার চেয়ে যমের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সহজ। ধর্মরাজও ধর্মাবতারের মত অত মর‍্যালিস্ট নয়। যদি সুপারিশ করতে যাই তাহলে ইণ্টারভিউতে ডাকবেই না সাহেব।

শুনে রত্নাকর রায় হাসলেন। তাঁর ন্যায়-বিচারের, নিরপেক্ষতার সুনাম যে কতখানি ছড়িয়েছে তারই প্রমাণ। ছোকরা মরতে রাজী, তবু তাঁকে অন্যায় অনুরোধ করতে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রেমালাপের পথে কাঁটা হবেন না তিনি। রত্নাকর চুপি চুপি চলে এলেন। খোশামোদে দেবতারাও তুষ্ট হয়। তিনিও একটু হচ্ছিলেন। এমন কি তাঁর এত সাধের ফিশিংটা যে মাটি হল তা সত্ত্বেও। কিন্তু পরের দিন চাকরি দেবার জন্য যখন দরখাস্তকারীদের ডাক পড়ল তখন তিনি সে কথাটা মন থেকে মুছে ফেললেন। এই ছোকরার তাঁর সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা যে আছে তা নিজের কানে শুনেছেন গোপনে। তবু তার জন্য খুশি ভাবটা মন থেকে মুছে ফেললেন। জাস্টিসের চেয়ে বড় কথা হুজুরের কাছে নেই।

রঞ্জিতের যখন ডাক পড়ল তখন তার মিনতিমাখা চোখের দিকে তিনি তাকিয়েই নিজের নজর অন্যদিকে ফেরালেন। চাকরি পাওয়াটা তোমার মরণ-বাঁচন সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমার ধর্ম তার চেয়ে বড়। আমি অবশ্য এক কলমের খোঁচায় তোমায় চাকরিটা পাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমিই তো যোগ্যতম প্রার্থী নও।

সব প্রার্থীর ইণ্টারভিউ হয়ে গেল। সাহেব তাদের সবাকার যোগ্যতা শেষ-বার বিচার করতে লাগলেন। না, বাঁশী বাজালেও ছোকরা নেহাৎ খারাপ করে নি। দাঁড়িপাল্লায় একটু আলৃতো চাপ দিলে ওর দিকের পাল্লাটাকেই ভারী বলে দেখানো শক্ত নয়। ছোকরা তাঁর উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখে। ধর্মরাজের চেয়ে বেশী ন্যায়-বিচার করেন বলে মনে করে।

ঠিক বলেছে ছোকরা। সেই জন্যেই বিশেষ করে ওকে চাকরিটা দেওয়া যায় না। এ হেন চুলচেরা বিচারের জন্য তিনি নিজের উপরই খুশি হয়ে উঠলেন।

আবার ছোকরার কথা মনে পড়ল। তোমায় না পেলে আমায় মরতেই হবে। হ্যাঃ, ও-সব ছাঁদা কথা অনেকেই বলে থাকে। বিলেতে 'কাফ লাভ' বলে যে জিনিসটাকে ঠাট্টা করা হয় এটা ঠিক তাই।

কিন্তু মেয়েটার কথাও ভাবতে হয়। রঞ্জু হয়তো মনের দুঃখ একা একা সামলে নিয়ে কয়েক মাস পরে সব ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াবে। বড় জোর বাঁশী বাজানো

কিছুদিন বন্ধ থাকবে। কিন্তু মেয়েটা অত সব শৌখান ব্যাপার করবার ফুরসতই পাবে না। সানাই বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মন বাঁধা হয়ে যাবে অন্য সুরে। তার পর আর একা থাকবার মোকাই মিলবে না। দুঃখের তো কথাই ওঠে না।

আচ্ছা, ধরে না হয় নিলাম যে মেয়েটারও খুব কষ্ট হবে। তা বলে আমি কি অন্যায় করতে যাব? ভজহরি যদি রঞ্জিতের চেয়ে এক রতি ভাল হয় তাহলে সোনা মাপার মত করে আমি রঞ্জিতকে বাদ দেব। অঞ্জনা? না, অঞ্জনার মুখটি বড় মিষ্টি, ভারী সুন্দর মেয়েটি। ওর মুখখানা ম্লান হয়ে যাবে সেকথা ভাবতে কষ্ট হয়।

তা হোক একটু কষ্ট। ওকে একটা অপদার্থ বাঁশুরের হাত থেকে বাঁচাচ্ছি এ কথাও আমি অবশ্য মনে করে নিতে পারি। তাহলে কোন কষ্টই হবে না। কিন্তু তা করতে যাব না। রঞ্জিতকে বাদ দিচ্ছি ন্যায়-বিচার করে। অঞ্জনা রঞ্জু এরা কেউ সে এলাকায় ঠাঁই পাবে না।

দিন দশেক পরে এস. ডি. ও. সাহেব দূরে মফঃস্বলে দশ ধারার মকদ্দমার বিচার করছেন। যারা "বি. এল" অর্থাৎ চাল-চুলোহীন আর হরেক অকাণ্ড করে বেড়ায় বলে পুলিসে সন্দেহ করে, তাদের একশো দশ ধারায় বিচার করা হয়। সাহেব এসব মামলায় একেবারে পাকা। পুলিসকে যেমন একচুলও মিথ্যে প্রমাণ সাজাতে দেন না, তেমনি সন্দেহ প্রমাণ হলে আসামীরও নেই রেহাই। কড়া মেজাজে তিনি এজলাস জাঁকিয়ে বসেছেন। পুলিস আসামী সাক্ষী সবাই তটস্থ।

এমন সময় তার এল। সদর থেকে জানিয়েছে যে একটা আত্মহত্যা ঘটেছে মনে হচ্ছে। ভদ্রঘরের ছেলে রঞ্জিত বোধ হয় আফিম খেয়ে মরেছে। কিন্তু ছোট হাকিম আর হাসপাতালের ডাক্তার দুজনই বেমারী পড়ে আছেন।

রঞ্জিৎ? সেই বাঁশুরে ছোকরা রঞ্জু? জ্বালাতন! আত্মহত্যার আর সময় পেল না হতভাগা। হতভাগা তো একেই বলে।

ঠিক তো। আজই ভোরে অঞ্জনাদের কলকাতায় চলে যাবার কথা। বিয়ে কলকাতায় হবে। এ শহরে অনেক লোকে রঞ্জু-অঞ্জনার কথা জানে। বিশ্বাস নেই কে কখন শেষ মুহূর্তে ভাঙচি দেবার চেষ্টা করে। রূপের শত্রুর অভাব নেই সংসারে।

হুড়মুড় করে সাহেব এজলাস ছেড়ে উঠে পড়লেন। মামলা স্থগিত রইল। পেশকার অন্য তারিখ দেখে ঠিক করে দেবে। তার আগে জরুরী তারে সদরে জানাবে যে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি মোটরে উঠে আরদালীকে জিনিসপত্র নিয়ে পিছনে আসবার জন্য বলে ঝড়ের মত রওনা হলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হরিসংকীর্তনের মত ভিড় করে লোক জমা হয়েছে রঞ্জুর ঘরের সামনে। পুলিস ইনস্পেক্টর দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে কয়েকটা কাগজ। পেছন থেকে লোকে ফিস ফিস করে অনুরোধ করছে,—পড়ুন, পড়ুন না একটুখানি। শুনি একটু জ্যান্ত নাটক-নভেলের গল্প। ইনস্পেক্টরের মুখ হাসি হাসি। যেন হরিলুটের বাতাসা এখনি ছড়াতে যাচ্ছে।

রাশভারী রত্নাকর এক লহমায় সব ব্যাপার বুঝে নিলেন। ইনস্পেক্টারের হাতের কাগজগুলি তাঁর হাতে এল। সব ভিড় ভয়ে সরে গেল। এমন কি জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারা চোখগুলিও। শক্ত সুরে ইনস্পেক্টারকে জিজ্ঞেস করলেন,—এ ঘরের কোন কাগজপত্র, জিনিস কিছু লিস্ট করেছেন? কিছু থানায় নিয়ে গেছেন?

না, হুজুর। আপনার আসার অপেক্ষায় আছি।

বেশ, খুব ভাল করেছেন। কিন্তু এটা যে আত্মহত্যা সেটা কি ডাক্তার সাহেব বলেছেন?

না, তিনি শুয়ে আছেন বাড়িতে। বোধ হয় আপনি এসেছেন খবর পেলে এসে হাজির হবেন। পোস্ট-মর্টেম তো করতেই হবে। তা ছাড়া ডেথ-সার্টিফিকেট ··।

আচ্ছা, আচ্ছা। সে সবই হবে। কিন্তু ফুড পয়জনিং, না ওপিয়াম সেটা জানলেন কি করে? আচ্ছা, ব্যাপারটা দেখে বুঝে-সুঝে আমিই য়্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জনের বাড়ি যাব রিপোর্টটা লেখাতে। আর ছোট হাকিম সাহেবকে আর অসুখের মধ্যে হাঙ্গাম করাবেন না। আমিই তো এসে গেছি।

হ্যাঁ স্যার, আমাদেরও ভাবনা ঘুচল। অঞ্জনাদের বিয়ের পার্টি আজ ভোরে রওনা হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন এস. ডি. ও.। পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের নিয়মকানুন আবার তাঁর তাঁবে পড়ে না। বিয়ের তারিখটা হচ্ছে কাল।

তিনি যেন নিজের মনে মনেই বললেন—দেখুন পোস্টমাস্টারকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে ব্যাপারটার এখনও তদন্ত চলছে। এর মধ্যেই এ সম্বন্ধে কেউ কোন তার কারও কাছে পাঠাতে চাইলে আগে যেন আমায় জানানো হয়। মানে, ডাকবিভাগের কোন নিয়ম ভাঙ্গা হোক এটা আমি চাই না। তবু, বুঝলেন তো, ব্যাপারটা তদন্তের অধীন। এ সম্বন্ধে কোন তারই কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। যান, যান, এখনি কথা কয়ে ঠিক করে আসুন। ততক্ষণে আমি একটু কাগজপত্র তালাস করে দেখছি।

বাইরে, ভেজানো দরজার বাইরে আরদালী দাঁড়িয়ে। ভিতরে তাড়াহুড়ো করে রত্নাকর রায় সব কাগজপত্র পড়ে যাচ্ছেন। ছোকরা, ছোকরা বোকা। প্রেম কি করে করতে হয়? চিহ্ন প্রমাণ রেখে? এই চিঠিগুলো, এই চিঠিগুলোর যে কোনটা হয়তো এরই ভালবাসার পাত্রীর সারা জীবনের উপর ছায়া ফেলে যেতে পারে। ইউ "রেচ"। তুমি একটা হতচ্ছাড়া।

সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা দেহটির দিকে তিনি তাকালেন না পর্যন্ত। সবগুলো প্রমাণ ঘেঁটে দেখতে হবে! প্রমাণের জোরেই বিচার হয়।

"আমার অঞ্জু,

এই সুন্দর ধরণী থেকে আমি আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। মরবার সাহস আমার নেই, কিন্তু তোমায় ছাড়া বাঁচবার শক্তি আরও কম। তোমার সবগুলি স্মৃতি, তোমার সমস্ত স্পর্শ আজ আমার অঙ্গে বহন করলাম। আজকের রাত্রি আমাদের মনে মনে মিলন-রাত্রি হয়ে রইল।

আমি জানি তুমি আমায় পাগল বলবে। জানি তুমি বলবে যে এতই যদি আমি মরীয়া, তবে সাহস করে কেন হাকিম সাহেবের সামনে হাজির হয়ে সব বললাম না? সেই চাকরিটাই আমার শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু তিনি হয়তো গোটা পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করে আমায় অপমান করতেন, তবু নিজের বিচার থেকে ভ্রষ্ট হতেন না। তাই পারলাম না।

আমি যে বিষ খেয়েছি তা অমৃত হয়ে উঠেছে আমার মনে। তুমি কাল ভোরে

চলে যাবার আগে কেউ জানবে না এ খবর। তুমি যখন অন্যের হয়ে যাবে তখন আমায় আর দেখতে পাবে না ম্লান মুখে তোমার সামনে। মরণের মাধুরী অনুভব করতে শুরু করছি। আর লিখতে ··”

এর পর আর কিছু লেখা নেই সে চিঠিতে। রত্নাকর রায় যেন ক্ষেপে গেলেন। ইউ কাউয়ার্ড, ইউ! এই বোকা দুর্বল ভীরু লোকটার প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। তিনি বিচারই করে এসেছেন এত দিন। শুধু ন্যায়-বিচার। জীবনে অসত্যের শবণ কখনও নেন নি। নেন নি রত্নাকর রায়।

সবগুলি চিঠি, ছবি আর প্রমাণ তিনি জড়ো করে নিলেন। তাঁর পোর্টফোলিযো ব্যাগটিতে জরুরী কাগজপত্রই শুধু থাকে।

সেদিন রাত্রে নিজের বাড়িতে বসে সেসব তিনি দেশলাই দিযে জালিয়ে দিলেন। তার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ন্যায়-বিচারের হাকিম, ধর্মরাজের চেয়ে বেশী সত্যবান রত্নাকরের মুখে ফুটে উঠল বেদনা। যে করুণ মমতা-ভরা বেদনা অনুভব করেছিলেন সেই পুরাকালে বাল্মীকি।

তার পর তিনি চেষ্টা করে একজিকিউটিভ ছেড়ে জুডিসিয়ারীতে চলে এসেছেন। অধর্ম অবিচার তাঁর ধাতে সইবে না। রক্তে নেই সেসব। কিন্তু সেই অধর্মটার চেয়ে বড় ধর্ম তিনি কখনও করেছেন কিনা তা বিচার করে খুঁজে পান না। যখনি সে কথা ভাবেন, ন্যায়-অন্যায সব কিছু ছাপিয়ে মনের মধ্যে বেজে ওঠে একটা কাব্যের সুর।

যে গলায় এতগুলি ন্যায়-বিচারের পুরস্কার—ফুলের মালা পরেছিলেন, সেখানে আনমনে তিনি হাত বুলোতে লাগলেন।

নভচারিণী

শেষ পর্যন্ত এরোপ্লেনটা কোনরকমে অজানা মাটিতে এসে নামল। দড়াম দড়াম করে মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ, যাত্রীদের চাপা আর্তনাদ আর কামরাটা একেবারে অন্ধকার।

ভাগ্যিস শুধু ওইটুকুই। বুক হাঁটু মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল সবারই। সিটের সঙ্গে আঁট করে বেল্ট দিয়ে বাঁধা পেট প্রায় ছিঁড়ে যায় যায়। কিন্তু প্রাণে যে বেঁচে গেলাম তাই যথেষ্ট।

আমিই কি ভেবেছিলাম যে এ যাত্রা রক্ষা পাব? বমি করতে করতে গলাটা প্রায় চিরে এসেছিল। মাথা ঘুরছে। বুক করছে ধুক ধুক। হুড়মুড় করে প্লেনের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা চলছে না। মনের মত শরীরও অসাড় হয়ে এসেছে। শুধু এটুকু চৈতন্য ছিল যে প্লেনটাতে যখন এখনও আগুন ধরে যায় নি ওদিকে ফিরে তাকালে বিপদ নেই। তাই পিছন ফিরে তাকালাম।

হাওয়াই জাহাজ তো নয়, যেন যমদূতের রথ। উঃ, এতক্ষণ কি পাগলা তাণ্ডবই না নাচছিল। ভিতরে আমরা একুশ জন যাত্রী। যেন খাঁচায় বন্দী পাখী। খাঁচাটা মাটির দিকে রওনা দিলেই প্রাণপাখীও আকাশের দিকে ফুড়ৎ করে উড়ে যাবে। কিন্তু মামলা অত সহজে শেষ হবে না। তার আগে ভয়ে ছটফট করব। হাড়গোড় ভেঙ্গে মারাত্মক জখম হব আর সব শেষে পেট্রলের আগুনে জ্যান্ত জ্বলে মরব।

নতুন রকমের সহমরণ।

আর একবার প্লেনের দিকে ফিরে তাকালাম। মনু তখনও মাথায় হাত দিয়ে প্লেন থেকে নামার সিঁড়িটার শেষ ধাপে বসে আছে। বেচারী মনু, সে-ও আমার সঙ্গে আজ সহমরণে যেত।

অন্য সহযাত্রীরা ততক্ষণে আমার মন থেকে মুছে গেছে। এমনিতেই অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আপন প্রাণ নিয়ে সবাই দূরে কোন গ্রাম আছে কিনা তার

খোঁজে সরে পড়েছে। পাইলট যে কোথায় গেল তা খেয়াল হয় নি। ভাগ্যের টানে আবার মনু আর আমি দুজনে একলা।

বিকেলের প্লেনটাতে আসাম থেকে কলকাতায় আসছিলাম। পাকিস্থান হযে যাবার পর বাবার বিরাট কমলার বাগানগুলি পথে বসে গিয়েছিল। শুধু বাবার নয়, বাঙ্গালী খাসিয়া সব কমলার ব্যবসাদারদেরই। রেলে বা স্টীমারে মাল চালান গেলে শুধু টুকরি আর পচা লেবুর গন্ধ ছাড়া আর কিছুই কলকাতায় পৌঁছাবে না। এদিকে শিলেটের দিকেও হিন্দুস্থানের কমলা অচল। কাজেই আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন আসে আসামে লোক নিয়ে, চালানী কাপড় আর হরেক রকমের মাল নিয়ে। ফেরৎ যায় খালি। দর কষাকষি শুরু করলাম একটা কোম্পানির সঙ্গে। ওদের প্লেনে নামমাত্র ভাড়ায় আলু, কমলা, তেজপাতা এসব চালান দেব কলকাতায়। ওদের যথা লাভ। আর আমার পৈতৃক ব্যবসাটা বেঁচে তো গেলই ; অন্য সব জিনিসেরই চালানী কারবার আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল।

সবাই খুশি হয়ে পিঠ চাপড়িয়ে ছিল। বাহবা দিল আমার স্বর্গগত বাবার বিষয়বুদ্ধিকে। তিনি সব পরীক্ষার রয্যাল ক্লাশ পাওয়া ছেলেকে আমেরিকায় বিজনেস্ য়্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যবসা চালানো শেখার জন্য এত খরচ করে পাঠিয়েছিলেন।

তার আগে অবশ্যই ছেলের বিয়ে দেওয়া দরকার। অনেক তোড়জোড় করে সম্বন্ধ ঠিক করলেন। দেশের লোকরা খুশি হল মানী শিক্ষিত ঘরে কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে বলে, মেসের বন্ধুরা হাল-ফ্যাশনের বন্ধুপত্নী জুটবে বলে। কিন্তু আমার মুস্কিলের খবর কেউ জানল না।

সাত মণ ঘি পোড়ানো শুরু হযে গেল বলতে গেলে। রাধাও যে নাচতে রাজী তা আমার জানতে বাকি নেই। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। দিনও প্রায় ঠিক হয়ে এল বলে। এখন একটু বিলেতী কায়দা-মাফিক পূর্বরাগে কারও আপত্তি নেই। মনুরও মনের নাগাল পেয়েছি।

একদিন রেড রোড়ে মটর ছেড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। গঙ্গার পার দিয়ে। একটার পর একটা ছোট আর মাঝারি সাইজের জাহাজের সারি জলের

উপর ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমিও কিছু দিন পরেই ওর চেয়ে বড় জাহাজে পাড়ি দেব। মনু আমার হাতে একটু হালকা চাপ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—আমিও যদি যেতে পারতাম তোমার সঙ্গে! তোমায় ছেড়ে থাকাই কত কষ্ট, তার উপর যাচ্ছ সেই দূর আমেরিকায়।

লক্ষ্য করলাম তার চোখ দুটি সে জাহাজের উপর থেকে সরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি বললাম,—চল না, তুমিও চল আমার সঙ্গে।

সে চুপ করে রইল। আবার যেই তার হাতে একটু চাপ দিলাম, সে বলল—আমেরিকা যেতে আর সেখানে থাকতে কত খরচ লাগে তা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি!

ওঃ, শুধু এইটুকু আপত্তি? নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বললাম—ওঃ, শুধু এইটুকু আপত্তি? তার জন্য একটুও আটকাবে না। তাহলে বল, আগে থেকে এখনি প্যাসেজ বুক করে রাখি।

মুচকি হেসে মনু বলল—তার মানে, তোমারও নিজের উপায় আছে?

আমিও হাসি বজায় রেখে বললাম,—বা রে, বাবার টাকাও তো আমারি টাকা। ঠিক যেন আমার টাকা থাকলে সেটা বাবার টাকা হত।

একটু ঝাঁজ দিয়ে মনু উত্তর দিল,—শেষেরটা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে প্রথম কথাটার দৌলতেই বাঙ্গালী ছেলেদের এত জুরিজারি। বাপের হোটেলের মত এত ভাল জায়গা দুনিয়াতে আর নেই।

মনুকে আমি একটু একটু করে চিনতে আরম্ভ করেছি। ওকে ভালও লাগে, ভয়ও করে। ও ভালবাসে শুধু আমাকে, আমার পরিবেশ শুদ্ধ, মিলিয়ে আমার বাবার ছেলেকে নয়। তবু হাওয়াটা হাল্কা রাখার চেষ্টা করে বললাম—নিজের তাঁবু না গাড়া পর্যন্ত ওই আস্তানাটা মন্দ কি?

ব্যঙ্গ করে সে বলল,—কেন আর একটা আশ্রমও তো আছে—সারং শ্বশুর-মন্দিরং। তবে সেটা হচ্ছে শুধু ছেলেদের বেলা।

ওর ব্যক্তিত্ব, নিজের স্বাধীন মন, আলাদা জীবনের উপর টান আমাদের পাঁচজনের সংসারে ঠিকমত মিশ খাবে না। এদিকে ওর মতিগতিকে আমাদের সবার চোখে সহজ করে নিতে, আমাদের সবাইকে ওর চোখে সইয়ে নেবার জন্য

আমিও থাকব না। অথচ একরকম পাড়াগাঁয়ে মানুষ সাবেকী বাবা-মা নতুন বৌকে বাড়িতে এনে যেভাবে তোলা তোলা করে রাখবেন তাতে মনু নিজেকে তালাচাবি বন্ধ বলে মনে করবে নিশ্চয়ই। ওই বাড়ি আর এই বৌ এ দুয়ের চাপে মাঝখানে শুকিয়ে ঝরে যাবে আমাদের সুখ, আমাদের জীবন।

সেদিন বর্ষার গঙ্গার রাঙা জলের পারে গোধূলি লগ্নে মনুর সঙ্গে যে কথা হল তাতে মনের মিলের ছাপ পড়ল না। আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবাসি। কিন্তু আমি তাকে চাই সংসারের মধ্যে, সবাকার মাঝে, ঘরের মাটির মধ্যে। সে চায় আমাকে সংসারের বাইরে, সবার থেকে আলাদা, আকাশের রামধনুর মাঝখানে। তাই আমাদের নিরালা আলাপের উপর কোন শাঁখের আওয়াজের, উলুধ্বনির আশীর্বাদ পড়ল না।

মনুই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করল।

হেসে ফেললাম। বললাম,—জানি না আর কোন্ বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে বন্ধ রাখতে বলত নিজে থেকে। যদি তুমি আমায় ভাল না বাসতে তবু হয়তো বুঝতাম।

ছল ছল করে উঠল তার চোখ। ঠিক গঙ্গার বুকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে যাওয়া আলোর মত। সে ম্লান স্বরে বলল—ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি। স্থির জেনো, তোমায় ভালবাসি। তোমারি জন্য অপেক্ষা করব। তবু, দুটি হাত ধরে মিনতি করছি, এখন বিয়েটা স্থগিত রাখ। আমার আমাকে যদি তোমার করে পেতে চাও, তাহলে তুমি ভবিষ্যতে ফিরে এলে আবার আমরা এখান থেকে শুরু করব।

মনুর বাড়িতে সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর আমাদের বাড়ি তো চটে আগুন। যত নষ্টের গোড়া ওই কলেজী হাল-ফ্যাশনেব মেয়েটা। কয়েকদিন আগে হলে আরেকটা সম্বন্ধ ঠিক করা যেত। কিন্তু এখন আর সময় নেই। ওরা এত চটে গেলেন যে মনুদের আর কোন খবরই রাখলেন না। প্রথমে ক্যালি-ফোর্নিয়া থেকে চিঠি লিখে মনুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। কিন্তু ওর বাবার অসুখের পর থেকে আর ওর কোন চিঠি পেলাম না।

দু-তিনখানা চিঠি লিখে কোন জবাব না পেয়ে আর চিঠি লিখি নি। দু

বাড়িতে মন কষাকষি খুব হয়েছিল। ভাবলাম এমন অবস্থায় চুপ থাকাই ভাল। দেশে ফিরে খোঁজ নিয়েছিলাম বৈ কি। মনুর বাবা মারা গেছেন, আর ওরা কোথাও উঠে গেছে—শুধু এটুকু জানতে পারলাম। তার বেশী খবরও করি নি। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মেলামেশার দেশ থেকে সবে ফিরে এসেছি। কাজেই কোথায় বা মনু, আর কোথায় বা বিয়ে করার মন।

শিলচর থেকে প্লেনে উঠেই বুকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলাম। মনু, সেই মনু, যে আমার হতে পারত, সে এয়ার-হোস্টেস। আমার সামনে ট্রে ধরে আছে। আর আমি, আমি আমেরিকান রেয়নের ঝকমকে স্যুট পরে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছি!

চায়ের পেয়ালা পিরিচ তুলে নিতে সাহস হল না। কি জানি, যদি অন্য যাত্রীরা দেখে যে আমার হাত কাঁপছে? হয়তো কাঁপবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই কাঁপবে না। মনু তো আমার কেউ নয়, কেউ ছিলও না। তবু ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখি কি বলে?

খুব সহজ গলায় সে বলল,—টি, প্লিজ।

আর কথা বাড়বার আগেই, লোকের নজরে পড়বার আগে আমি শুধু একখানা স্যাণ্ডুইচ তুলে নিয়ে বললাম,—আর নয়, ধন্যবাদ।

তার পর কিছুই যেন হয় নি,—কিছুই যেন ভাবছি না, নরম চেয়ারটাতে বসে মুখ জানালার দিকে করে শক্ত হয়ে বসে রইলাম। পূবদিক অন্ধকারে ভরে এসেছে। পশ্চিমে এখনও একটু রঙের ছোপ।

শুধু অন্ধকার নয়, ঘন মেঘ। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ ভীষণভাবে প্লেনের পাখার একেবারে পাশ দিয়ে ঝিকমিক করে গেল। নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই প্লেনটা গোত্তা খেয়ে হাজার দুই ফুট সোজা নেমে গেল। পেটটা মনে হল ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রাণ যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসবে সেই ধাক্কায়। এয়ার-হোস্টেস গলা চড়িয়ে চেঁচাচ্ছে ইংরেজীতে—চেয়ারের বেল্টের সঙ্গে নিজেদের শক্ত করে বেঁধে নিন, বেঁধে নিন।

না। এই গোত্তাটার হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলাম। পাইলট কোন রকমে প্লেনকে সামলিয়ে তার নাকটা উঁচুতে তুলে নিল। তবু আমরা

অনেকখানি নেমে এসেছি এক ধাক্কায়। আবার যদি একটা এয়ার পকেট অর্থাৎ হাওয়াহীন এলাকায় পড়ি, নির্ঘাৎ প্লেন বেসামাল হয়ে ভূঁয়ে আছাড় যাবে। ঝড় যেন মাতাল হয়ে ওলট-পালট করে আছাড় দিতে লাগল প্লেনটাকে। ঠিক ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত। কয়েকজনের সীটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখার বেল্ট ছিঁড়ে গেল টানের চোটে। বমি শুরু করল অনেকেই। আমিও। সবার সামনের জোড়া সীটে বসেছিল নতুন বিয়ের বর-কনে। প্রলয়ের দোলানীতে ওদের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। এয়ার-হোস্টেস্ ছুটে গিয়ে ওদের সামনে কাগজের ঠোঙা ধরল। বমি যেন কারও গায়ে ছিটকে না পড়ে।

আমার সারিতে ও-পাশে বসেছিল এক মাদ্রাজী অফিসার। চোখ তার একেবারে বোজা। হাত দুটো দু পাশে এলিয়ে পড়েছে। এয়ার হোস্টেস কোন রকমে টলতে টলতে তার কাছে এল। শুকনো গলায় আমাকেই জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক হার্টফেল করেছেন নাকি?

আমি তাকে জোরে নাড়ানাড়ি করতে লাগলাম। সে চোখ মেলতেই জিজ্ঞেস করলাম—কি মশায়, চোখ বুজে কি করছেন? প্রাণায়াম নাকি?

খুব নির্লিপ্তভাবে জবাব এল—প্রার্থনা করছি, হে ভগবান, মরব তো আজ নিশ্চয়ই। এখ্খনি। কিন্তু ভগবান, প্লেনটা মাটিতে আছাড় খাবার আগে যেন হার্টের কলকব্জাগুলো বন্ধ হযে যায়।

এতক্ষণে মনু তাকাল আমার দিকে। শুধু এক নিমেষ। তার পরই আবার সে এয়ার-হোস্টেস।

শেষ পর্যন্ত পাইলট অনেক কৌশলে কোন রকমে একটা সমতল মাঠের মধ্যে প্লেনটাকে নামাল। আমরা একুশ জন প্রাণী প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু বেঁচে গেলাম। সবাই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের সন্ধানে ছুটল। রইলাম পিছনে পড়ে শুধু আমি আর—আর মনু।

আস্তে আস্তে আমি ওর দিকে এগিয়ে এলাম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সে উঠে ওই প্লেনের আঁধার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে গেল। খুব অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় দেখলাম সে ট্রে-হাতে বেরিয়ে এল। তাতে কাগজের গেলাস আর খাবার জল।

ইংরেজীতে বললাম—না, ধন্যবাদ, মিস্। আমার জলে দরকার নেই।

ইংরেজীতেই উত্তর হল—কিন্তু মুখে একটু জল ছিটিয়ে নিন। একটু তাজা লাগবে। ফ্লাস্কের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিছু কমলালেবু দিতে পারি।

বললাম—তা কয়েকটা লেবু বাইরে নিয়ে আসুন। আপনারও খাওয়া দরকার।

একেবারে অন্য পৃথিবীর লোক এয়ার-হোস্টেস। খুব গা-ছাড়া ভাবে বলল—আমি এখনও ডিউটিতে আছি। আগে যাত্রীদের প্রতি কর্তব্য।

এখনও কথাবার্তা ইংরেজীতে চলছে। একটু অন্তরঙ্গতার ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বললাম—কিন্তু এ-রকম একটা অবস্থায় আমারও তো মহিলার প্রতি একটা কর্তব্য আছে।

ঠোঁট চেপে সে উত্তর দিল—না, মিস্টার প্যাসেঞ্জার। যতক্ষণ প্লেন দমদমে না পেঁছায় আমি কোম্পানির ডিউটিতে আছি।

একটা যেন কিনারা পেলাম। বাংলায় বললাম—বেশ তো মনু, তার পরে তো অন্তত আমায় তোমার প্রতি কর্তব্য করতে দেবে!

বলতে বলতে বুঝতে পারলাম যে তার মুখ শক্ত হযে উঠেছে। তাই সে কোন বাধা দিতে পারবার আগেই আমি ঝড়ের মত বলে চললাম—মনু, মনু, তুমি এত কঠিন কেন? এতদিন পরে, এত খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু তুমি আমাকে যেন চিনতেও পারছ না। তুমি কেমন আছ সে কথা তো অন্তত বল।

কোন রকম ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে সে বলল,—আমি তো ভালই আছি। এয়ার-হোস্টেসদের খারাপ থাকতে নেই। চাকরির একটা সর্ত হচ্ছে এই। আর এত বড় সংসারের ভার যার উপর সে ভালই থাকে।

একটু যেন পথ তৈরী হল কথাবার্তার জন্য। চট করে বললাম,—খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে, তোমার বাবা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুমিই বড় ছিলে। তা সংসারটা কি তোমারই ঘাড়ে এসে পড়েছে?

একটুও বিরক্ত না হয়ে সে বলল—ঘাড়ে কেন হতে যাবে, হাতে বলুন। আপনি কি আমেরিকাতে দেখেন নি কত সংসারে মেয়েরাই কর্তা সেখানে?

সে ঠিক কথা। কিন্তু এদেশ তো আমেরিকা নয়!

ঝাঁজের সঙ্গে সে বলল—অর্থাৎ এদেশে সব মেয়েকেই বিয়ে করে বাঁদী হতে হবে! বাঁধা পড়তে হবে নির্ভাবনায়, বিনা দায়িত্বে দু মুঠো খেতে-পরতে পাবার মতলবে!

বাধা দিয়ে বললাম—না, না, আমি সেভাবে মোটেই বলছি না। তুমি তো জানো, আমি কোনদিন তোমাকে তেমন চোখে দেখি নি। তাই তো আমেরিকা যাবার আগে বিয়ে করে চটপট তোমায় সিন্দুকে পুরে রাখবার বন্দোবস্ত ভেঙ্গে দিয়ে গেলাম। তোমারি কথামত।

চুপ করে রইল মনু।

আবার বললাম,—কিন্তু তুমি এমন নিষ্ঠুর যে আমার চিঠিরও জবাব দিলে না। এমন কি নিজেকে একেবারে নিখোঁজ করে ফেললে।

খুব শান্ত ভাবে সে উত্তর দিল,—বিয়ে স্থগিত রাখাতে তোমার আর আমার বাড়িতে যে রকম হৈ-চৈ হল তাতে এছাড়া কি উপায় ছিল? দু হাত যেখানে এক হয় নি সেখানে দুটো মন এক হওয়া যে শাস্ত্রের বারণ। তোমার সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ আছে জানলে সবাই তো জ্বলে উঠত।

বললাম—বেশ তো, অন্তত জানাতে পারতে যে যতদিন না ফিরে আসছি ততদিন যেন চিঠি না লিখি। না হয় দেশে ফিরে নতুন করে তোমায় জানার পথটা খোলা রাখতে। তুমিই ভরসা দিয়েছিলে যে, আমি ফিরে এলে আবার একসঙ্গে মিলিত হব। তুমি আমার হবে।

অন্ধকারে চুপ করে রইল সে। আমিই আবার কথাটা ফিরে বললাম। মনে করিয়ে দিলাম তারই দেওয়া প্রতিশ্রুতি, তারই প্রেমের আশ্বাস।

কিন্তু সে বলল—পথ কোনদিকেই খোলা রইল না। আমার বাবাও মারা গেলেন। একটা বড় সংসার আর ভাঙ্গ ঘরের চাল-চলন ছাড়া কিছুই রেখে যান নি। তখন কি আর তোমার কাছে চিঠি লেখা যায়?

একটু হয়তো তীক্ষ্ণ ভাবেই বললাম—অর্থাৎ তুমি আমায় পুরোপুরিই পর ভেবে রেখেছ।

আস্তে আস্তে সে উত্তর দিল,—এটা আপন-পরের কথা নয়। সব দিক যখন

ঠিক ছিল তখনও পাছে তোমার অনুপস্থিতিতে আমি আঘাত পাই সে ভয়ে বিয়ে পেছিয়ে দিলাম আমরা। পরে যখন আমার দিকটা ভেঙ্গে গেল তখন আর ভরসা করব কোন্ বালুচরে? কাজেই চাকরি নিতে হল। তোমার কাছ থেকেও লুকোতে হল।

তা বলে এই চাকরি?

আর কোথায় শুধু কলেজী বিদ্যার জোরে এত মাইনে পেতাম? এতটা সময় পেতাম ভাইবোনদের দেখার জন্য? আর এ অবস্থায় যদি তোমার কাছে এসে দাঁড়াতাম—তার মানে হত খুবই পরিষ্কার।

মিনতি করে বললাম—তুমি তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার মুখ চেয়ে আর সব কিছু ভুলে যাচ্ছ। তুমি কেন ভাব না যে, বিপদে পড়ে যে তুমি আমার কাছে আসতে, সে তুমি তোমার স্বচ্ছল জীবনের বাবার মেয়ের চেয়ে মানুষ হিসাবে কোন অংশে কম নও। তোমার শিক্ষা, তোমার ব্যক্তিত্ব আরও বড় হয়ে গিয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। আমার চোখে তুমি আরও বড় হয়ে গিয়েছ। এবার এস আমরা এক হয়ে যাই।

একটুখানি হাসল সে। অন্তত অন্ধকারে তাই মনে হল। বলল,—যাক, তবু ভাল যে আমার ঘরে এস—একথা তুমি বল নি।

না, না। আমার একার ঘর তো কোন দিনও হতে পারে না। আমাদের দুজনের ঘর।

তবু, তবু সে ঘর আমার হবে না। আগে আমার সাহস হয়তো কম ছিল, কিন্তু ছিল স্বাধীনতা। আজ আমার আর যা-ই থাক স্বাধীনতা নেই, কর্তব্য আছে। মা আছেন, ভাইবোন আছে।

বুঝলাম যে আগে যে-মেয়ের মনের স্বাধীনতা সোডার বোতলের মত উছলিয়ে উঠত, তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যেত, হয়তো মত বদলিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু মনুর মনে আজ উচ্ছ্বাস নেই। জল গেছে বরফ হয়ে।

তবু তাকে তো সমঝিয়ে নিতে হবে। আমার নিজের যে ওকে কতখানি দরকার তা আজ বুঝতে পেরেছি। যেমন করেই হোক ওর মনকে বদলিয়ে নিতে হবে। ব্যাকুলভাবে তাই বললাম,—ওরাও তোমার বাড়িতে থাকতে

পারবেন। তোমার বাড়িও তাদের বাড়ি।

শক্তভাবে মাথা নেড়ে সে বলল—আর তা হয় না সহজে। কেন জান? মনের পিছনে সব সময় খোঁচা থেকে যাবে। যাকে ভালবাসি তার সবাইকেই ভালবাসি এ নিয়ম আর আজকালকার সংসারে চলে না। এখন সবই হচ্ছে টাকা-আনা-পাইয়ের সঙ্গে হিসাবে কষা। তাই···

চট করে বললাম,—তবে তোমারও মা-ভাই-বোনদের ভালবাসায় টান পড়বে ক্রমাগত তাদের বোঝা এরকম করে একা বয়ে বেড়ালে। সেজন্যেই তোমার আমায় বিয়ে করা বেশী দরকার। অন্তত পক্ষে তাদের তো আমার কাছে তেমন সংকোচ থাকবে না।

তোমার কাছে আরও বেশী করে থাকবে। তুমি যে ছিলে সুদিনের···

কথাটা শেষ করতে দিলাম না। দেবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। বললাম—শুধু সুদিনের কেন, দুর্দিনেরও। বোঝ না কি যে আজ আমরা দুজনে সহমরণেও যেতাম একসঙ্গে। ভগবান পর্যন্ত যা চান তুমি তাতে 'না' করো না।

হেসে ফেলল মনু। হাউ সেন্টিমেন্টাল! আমারও মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু জোর করে সে কথা মুছে ফেললাম। যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কর্তব্য আছে। কোম্পানির উপর, বাড়ির উপর। তার পর সবই হাওয়া।

আর থাকতে পারলাম না। এগিয়ে এসে তার হাতটা আলগোছে তুলে ধরলাম। কাতর মিনতি করে বললাম—হাওয়া হাওয়া, ছেড়ে দাও এই হাওয়ার চাকুরি। নেমে এস তোমার নভচারিণীর জীবন থেকে মাটিতে। আমরা মাটিতেই ঘর বাঁধি, হাওয়ায় নয়।

কোন সাড়া দিল না। তবে কি আমার কথা তার মনে ঢুকছে?

বললাম, তোমার আদর্শ, তোমার মনের গতি সবই আকাশে ওড়ে, আকাশের মতই উঁচু। কিন্তু লক্ষ্মীটি, এবার নেমে এস মাটিতে।

দূরে লণ্ঠন নিয়ে একদল লোক আসছে দেখা গেল। পাইলট আর রেডিও অফিসারও তাদের সঙ্গে। মনু তাড়াতাড়ি বলল—এবার থাক ও-সব কথা। বিজলী আর রেডিওর কলকজা মেরামত করে দমদমে খবর দিতে হবে। তার আগে ওদের একটু তদারক করব আমি।

বেশ তো আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি কথা দাও।

জোরে মাথা নেড়ে মনু বলল,—তুমি অত্যন্ত অন্যায় দাবী করছ। আমার কাজ আছে, কর্তব্য আছে।

প্রতিবাদ করলাম—আকাশের কাজ ছেড়ে মাটির উপর নেমে এস। আমার প্রতিও কি তোমার একটু কর্তব্য নেই?

কোন কথাই শুনল না। শুধু আকাশ আর মাটি যেখানে মিলিয়ে যায় সেদিকে একটুক্ষণ তাকাল। তার পর নভনীল ইউনিফর্ম শাড়ির আঁচলটা তুলে নিয়ে প্লেনের ভিতর ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হাতে একটা টর্চ, তাতে সরু পেন্সিলের মত আলোর রেখা। লোকদের প্লেনের দিকে আসতে ইশারা করছে। আমি মুছে গেলাম যেন অন্ধকারে।

না। আমিও ওই আলোর রেখার দিকে তাকিয়ে আছি। নভচারিণীকে এক সময় তো মাটিতে পা পাততে হবেই।

শেষ

এই লেখকের—

ইয়োরোপা

প্রেমরাগ

রাজোয়ারা

অর্ধেক মানবী তুমি

রোম থেকে রমনা

রাজসী

রক্তরাগ

হিন্দীতে :—

য়ুরোপা

রজবাড়া

অধখিলী

মাস্কো সে মাড়বার

রক্তরাগ

তামিলে :—

নাডু নিশি কানাডু

গুজরাতীতে :—

রক্তরাগ

মালয়ালীতে :—

রক্তরাগিণী

ইংরেজীতে :—

ইউরোপা